B
759.92
B299S

শ্রীনন্দলাল বসু

পূজনীয় আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর অশীতিতম বর্ষে প্রবেশ-উপলক্ষে অকৃতী ছাত্রের ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি-সংযুক্ত প্রণামনিবেদন-স্বরূপে এই গ্রন্থের প্রকাশ। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। তৃতীয় নিবন্ধ রূপান্তরে লেখকের 'চিত্রদর্শন' গ্রন্থের অন্তর্গত।

এই পুস্তকের প্রকাশব্যাপারে শ্রীবিশ্বরূপ বসু, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীঅরুণাচল পেরুমল, শ্রীশুভেন্দু ঘোষ, শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশুভ মুখোপাধ্যায় -প্রমুখ বন্ধুবর্গের উৎসাহদান এবং সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

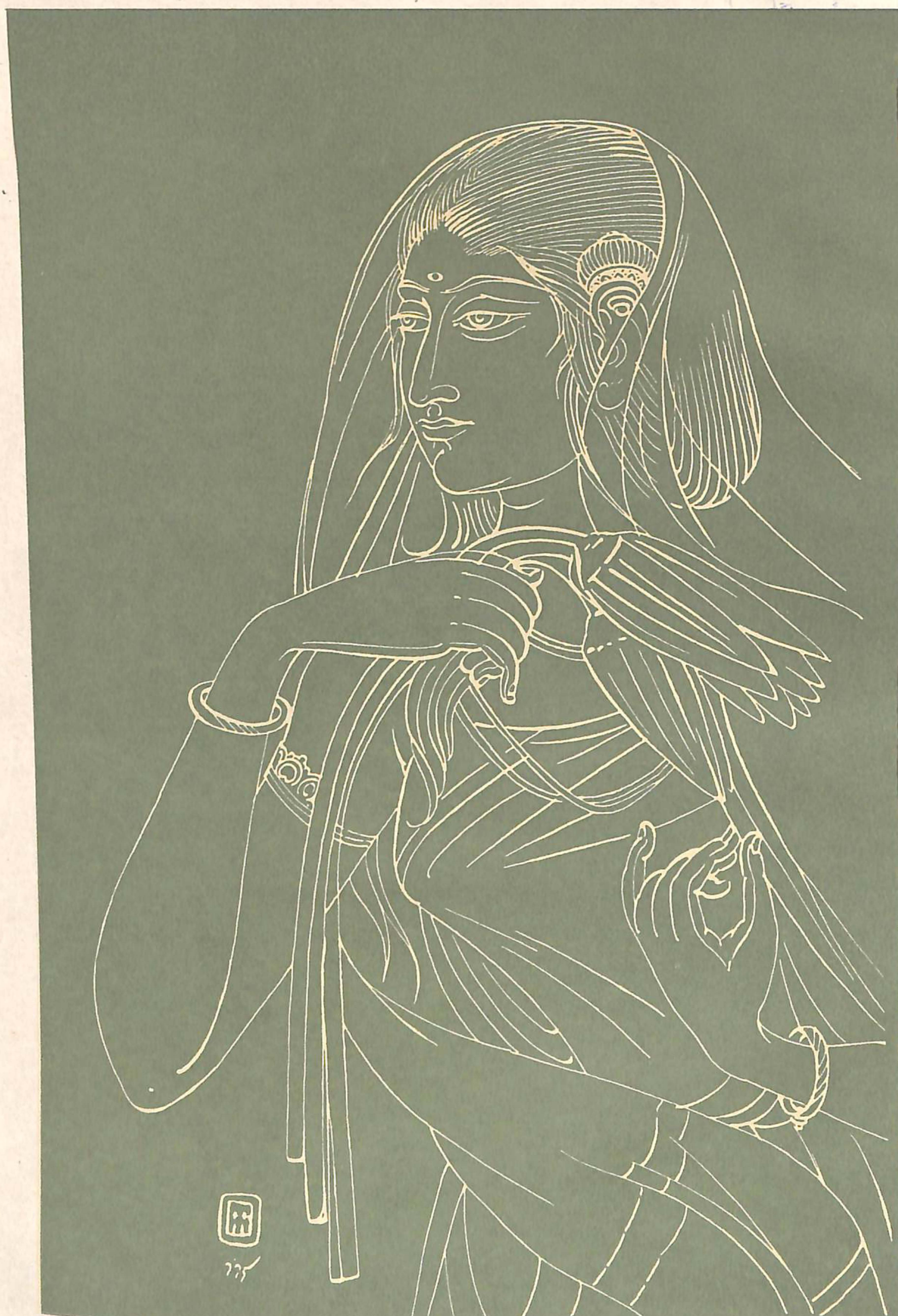

Nandlal Basu

শ্রীনন্দলাল বসু

কানাই সামন্ত

Kanai Samanta

মাঘ
১৩৬৯

1369

Kathashilpa

কথাশিল্প-প্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

Calcutta

আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ-উপলক্ষে

গ্রন্থপ্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯ : জানুয়ারি ১৯৬২

B
759.92
B 299 S

Library IIAS, Shimla
B 759.92 B 299 S
00009490

প্রকাশক : শ্রীঅবনীরঞ্জন রায়
কথাশিল্প-প্রকাশ। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY
Acc. No. 9490
Date 3.5.66
SIMLA

মুদ্রক : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিশ স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

মূল্য সাড়ে ছয় টাকা

পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়সূচী

৯	রূপরাগের কবি চিত্রকর
১৩	জীবনকথা
৪৩	প্রতিভা ও রূপশৈলী
৫৫	নূতন রূপকৃতি
৭০	নূতন তাৎপর্য
৭৭	চিত্রপঞ্জী

ক্রমিকসংখ্যা	চিত্রসূচী
১	শারদা
২	জগাই-মাধাই
৩	অজ্ঞাতবাসে অর্জুন
৪	উমার ব্যথা
৫	হলকর্ষণোৎসব
৬	শ্রীদুর্গা
৭	কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
৮	চুল বাঁধা
৯	গ্রামের মেছো
১০	শৈলাবাস
১১	বাউল
১২	শৈলকুহেলী
১৩	শিবগিরি
১৪	জলপ্রপাত
১৫	পুঁটিমাছ
১৬-১৭	লালন ফকির ও তুম্‌কার জঙ্গল
১৮-১৯	'ছেঁড়া' ছবি

এই গ্রন্থের সবগুলি প্রতিচিত্র পূজ্যপাদ আচার্যের অনুমোদন-ক্রমে মুদ্রিত। তন্মধ্যে ৪, ৭, ১২ অঙ্ক-চিহ্নিত চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন - আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে এবং ৫, ১১, ১৩, ১৪, ১৫ চিহ্নিত ছবির ব্লকগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় ছবিখানি আহমদাবাদে শ্রীকস্তুরভাই লাল-ভাইয়ের চিত্রশালায় সংগৃহীত। চতুর্থ চিত্র রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ-ভুক্ত। একাদশ সংখ্যার কার্ড্‌খানি বন্ধুবর শ্রীঅরুণাচল পেরুমলের সংগ্রহে। মূলচিত্রের অধিকারীগণের সৌজন্য সকল ক্ষেত্রেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকৃত।

পূজনীয়া
শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর
করকমলে

অনন্ত নীল আকাশ শিয়রে।
ছোটো বাড়ি।
বাড়ির সমুখ দিয়ে রাঙা মাটির পথ
বেঁকে চলে গেছে বহু দূরে॥

ঘুম ভেঙে পূবের জানলায় বসলে দেখা যায়
শালবনের উপর আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করছে।
ক্রমে নব সূর্যোদয়ের অরুণাভা লাগে শান্ত মেঘে।
নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যায়।
বনের ঘন পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে
শিশিরসিক্ত ঘাসে এসে পড়ে তির্যক্ রশ্মি।
সন্ধ্যাকালে ঘরের দাওয়া থেকেই দেখি
একসার তালগাছের পিছনে
পশ্চিম দিক জুড়ে বর্ণের সমারোহ।
দূর থেকে দূরে মূক মাটির আহ্বান প্রসারিত।
ক্রমে সূর্য ডুবে যায়,
সাঁওতালি বাঁশির সুর নীরব হয়,
উর্ধ্ব-আকাশে তারা ফুটে ওঠে একটির পর আর-একটি॥

দক্ষিণে ধানের ক্ষেত আজ সোহাগে উছলে উঠে
দিগন্ত ছুঁতে চায়।
উত্তরে অবাধ প্রান্তর
তরুবিরল, তৃণবিরল, আসক্তিহীন।
কার পানে চেয়ে দেখি ভেবে পাই নে ॥

শিশিরশোভিনী সকালবেলা যেখানে
পরশমণির পরখ করে রোজই,
থেকে থেকে হাওয়া ওঠে,
নতমুখে স্থির হয়ে ছিল যে শিষগুলি
সচঞ্চল কানাকানি করে মাঠ ব্যেপে ;
হেথা-সেথা উৎফুল্ল কাশের সারি
নাচের তালে ওঠে দুলে দুলে,
শরৎকালীন মেঘের লীলায়
ছায়ার পিছনে আলো
আলোর পিছনে ছায়া
নিরন্তর মায়া বুলিয়ে চলে অলস দুপুরে ;
কৃষকেরা আল বাঁধে, ক্ষেত নিড়োয় ;
মেঠো গান তাদের দূর থেকে মিঠে লাগে ;
আল-পথে হাটের লোক
কোথাও হাঁটু-ভোর কোথাও কটি-অবধি
সবুজের বন্যায় ডুবে হাটে যায়, হাট থেকে ফেরে ;
শালিখ টিয়ে কলকাকলি জাগায় ;
ধানের ডগায় দোল খায় আর ক্ষুধা দূর করে টুনটুনি ;
দু-একটা বক ক্ষেতের উপর-উপর উড়ে উড়ে
নীলাভ দিগ্‌বনানীর পটে দেখায় অতি সুন্দর ;
বিভিন্ন সীমানায়—
ইঁটের পাঁজার ভাঙা পাঁজর ছেয়েছে উল্লসিত লতা,

চাল-কলের চিম্‌নি ঢাকা পড়েছে গাছপালার অন্তরালে,
বাঁশবন আগ্‌ বাড়িয়ে চুম্বন করতে চায় কার আঁচলাটিকে,
ঝির্‌ ঝির্‌ করে অশথগাছ,
প্রচ্ছন্ন কুটীর থেকে ধূম ওঠে সকালে সন্ধ্যায়,
কীর্তনের সুর ওঠে
মৃদঙ্গ বাজে
শুক্লরাতের স্বপ্নাবিষ্ট প্রহরে।···
অন্নপূর্ণা জননী এখানেই
কোল মেলেছেন সন্তানের জন্যে ॥

যেখানে অবাধ প্রান্তর ঐ উদাসীন,
রুক্ষ বুকের উপর রক্ত উপবীতের মতো দেখায় তার
পায়ে-পায়ে-আঁকা শীর্ণ পথ ;
আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষণেও দুঃসাহসী তৃণ
সসংকোচে দেখা দেয় এক ধারে,
হেমন্তেই জ্ব'লে যায়,
আলগা মাটি ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
পৃথিবীর পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে এক দিকে ;
গেরি মাটি আর কাঁকরে রচিত সারি সারি খেলার পাহাড় ;
ইতস্ততঃ ছড়ানো পোড়ামাটির চাঙ্গড়—
যেন কালো মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্মীক,
প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রামের অস্ত্রশস্ত্র, ভাঙা, মর্চে-পড়া ;
মাটি চুঁয়ে জল জমতে জমতে
ভীরু এক-একটি ধারা বয়ে গেছে নিম্নে বালুর বিছনে ;
তৃষিত তৃণ আর বিচিত্র বর্ণের পুষ্পকণিকা
গোপনে এসে ভিড় করেছে সেই গুপ্ত তীর্থে ;
পথভোলা প্রজাপতি কখনো আসে
হলদে ডানা নেড়ে রোদের বেলায় ;

সাপ লুকোয় কাঁটাঝোপে, কালো মাটির ফাটলে ;
ছাই রঙের পাখি ধূসর একাকারে মিশে নিঃশব্দে ফেরে সমস্ত দিন,
প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় টী-টী শব্দে সাড়া দেয় সঙ্গিনীকে।
এ খোয়াইডাঙার আকাশে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের অভ্যর্থনা নেই
পিক-পাপিয়ার কলকূজনে,
কম্পিত বনপল্লবের আলোছায়াময় বিচিত্র মূর্ছনাতে।
প্রান্তরের এ পার থেকে
সাঁওতাল-রমণী কখনো আসে বালু খুঁড়ে জল নিতে,
কদাচিৎ সাঁওতাল-ছেলে যায় ও পারে ওদের ক্ষুদ্র পল্লীতে ;
প্রব্রজিত এক-একটা তালগাছ দীর্ঘ উপবাসে
কী গূঢ় সঞ্জীবনরসে জেগে থাকে তবু ছত্রাকার পত্র মেলে ;
নিঃসঙ্গ আকাশে অপরূপ আশ্চর্য তাদের ইশারা—
নন্দীভৃঙ্গীর মতো তারা স্তব্ধ, তারা তন্দ্রাহীন।...
এখানে, রিক্ত এই প্রান্তরের বুকে,
সন্ন্যাসী শিবের যোগের আসন ॥

এইখানে
দিনযামিনীর উদয়াস্ত যেখানে সহজ,
হরগৌরীর মিলন যেখানে সম্পূর্ণ,
অবারিত দিগ্‌বলয়ের কেন্দ্রস্থলে ছোট্টো বাড়ি।
বাস করেন ভক্ত নন্দলাল—
রূপরাগের কবি,
চিত্রকর ॥

বোলপুর
২০ আশ্বিন ১৩৪২

জীবনকথা

'চলো, নন্দলালের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিইগে' —এই কথা ব'লে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তরুণ এক শিল্পশিক্ষার্থীকে নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পাঁচ নম্বর থেকে ছ নম্বরে, দোতলার এক ঘরে। অলৌকিক প্রতিভা অপরূপ মূর্তিতে অধিষ্ঠিত ছিল সেই ঘরটিতে, ১৩৩০ সালের সেই ভুলে-যাওয়া তারিখে। শিল্পরুচি ও রূপৈশ্বর্যের সুষমাময় প্রকাশ ছিল বৈকি চতুর্দিকে; কবির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপশ্রী ও শালীনতা, ঔদার্য ও গাম্ভীর্য, সেও ছিল সম্রাটের মতোই— কিন্তু, সে দিকে তো সহসা চাওয়া যেত না, অথবা চাইলেও দেখা যেত আপন মহিমাতেই আপনি আছেন আবৃত। শুনলাম—

অরুণদুয়ার খোলো,
এসো এসো নীরব চরণে

এই সুরটি ধরিয়ে দিচ্ছেন তিনি গানের দলকে। শিউরে-ওঠা সমস্ত শরীর দিয়ে শুনলাম। স্বরগ্রামের উচ্চতম সপ্তকে উঠে সত্যই যেন অরুণদ্বার ছুঁয়ে এল সুর, খুলে গেল অলক্ষ্য কবাট, ফোটো-ফোটো সোনালি চাঁপার স্নিগ্ধ-কোমল দ্যুতিতে দ্যুলোকের আলো লুটিয়ে পড়ল প্রণত ভূলোকে।

'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হবে। তাই কবি দলবল নিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতায়। রূপসজ্জার ভার নিয়ে সঙ্গে এসেছেন শিল্পী নন্দলাল। কবেকার কোন্ সুকৃতির ফলে জানি নে পরিচয় হল, প্রণাম করলাম, বাসায় ফিরে এলাম হীরকের মতো দ্যুতিবিচ্ছুরিত দুর্লভ সেই মুহূর্তটিকে মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত ক'রে।

অবনীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে, স্বতউৎসার উৎসাহে উল্লাসে, অভিনয়ে, আপনার চিরবালকস্বভাবে, সর্বদাই উচ্ছলিত, নন্দলাল তেমনি সংযত, গম্ভীর, আত্মস্থ ও স্বল্পবাক্। উভয়েরই প্রতিভা অলৌকিক, রূপ-কৃতি অনন্তবৈচিত্র্যময়, সাধনা অতন্দ্র এবং সিদ্ধি যুগ-যুগান্তরের সৌভাগ্য ও সম্পদ্ বলতে হবে। স্বভাবের এ বৈচিত্র্য বা আপাতপ্রতীয়মান বৈপরীত্য

কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আজ মনে জাগছে তট এবং তরঙ্গিণীর উপমা। একটি নিত্যচঞ্চল, আরএকটি দৃশ্যতঃ স্থির। একটি ছায়া বা ছবি কিছুই ধরে রাখে না, তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিয়ে খেলিয়ে ভাসিয়ে দেয় পার থেকে অপারের দিকে ; আরএকটি কায়া মায়া সবকেই আশ্রয় দেয়, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেয় পদতলে, মাটির ঘর গড়তে দেয় বাসের জন্যে, পাষাণের দেউল তুলতে দেয় আকাশোৎসুক ধ্যানের ও আরাধনার অনুকূলে। দৃশ্যতঃ এতই বিভিন্ন, এতই বিপরীত। তবু তো একটিকে না হলে আরএকটির চলে না। কবির ভাষায় বলা যায়— স্তব্ধ তট আর উচ্ছলিত তরঙ্গ উভয়ের যোগেই জীবনের গান। উভয়ের যোগেই বাঙলার তথা ভারতের নব-উদ্‌বোধিত রূপকলার আশ্চর্য আকার ও সুষমা, ব্যাপ্তি ও গভীরতা, প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা।

যে কালের কথা তুলেছি সেই সময়টিতে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রায়ই বলতেন অবনীন্দ্রনাথ— 'ছবি আঁকা শিখবে তো, যাও নন্দলালের কাছে।' কখনো বলেছেন— 'আমার ঝুলি ঝেড়ে সব বিদ্যা দিয়ে এসেছি নন্দলালকে।' কখনো বলতেন— 'নন্দলাল আমার প্রথম ও শেষ ছাত্র।' কখনো বা— 'ও আমার কাঙালের ধন, ভিক্ষার ঝুলি, ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি আমার— হাতছাড়া করব না, দেব না কাউকে।' সে বলার ভঙ্গী বা কত, সুর কত, আর কী অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতি -সিঞ্চিত, গুরুগৌরবে ও গরবে ডগোমগো, যে না শুনেছে, না দেখেছে (অবনীন্দ্রনাথের কথা শোনবার ছিল না শুধু, দেখবারও— রাধা-কানুর মতো আধা তার ভাব ভাষা, আধা তার রূপ ছন্দ) না দেখেছে যে, তাকে তো বর্ণনা ক'রে বোঝানো যাবে না।

যা হোক, কোনো সম্বল ছিল না, সেও হাজির হল একদিন কবিতীর্থে। বীরভূমের রাঙা ধুলোর রাস্তায় মাথা ঠেকিয়ে বলল না কি—

'রবীন্দ্রের এ কবিব্রজের অরুণ রজের
স্পর্শ লইলাম ললাটে আমার' ?

পৌঁছে গেল কলাভবনের সীমানায়, নন্দনের নাচদুয়ারে। অহেতুক সৌভাগ্য-হেতু গৃহীত হল, স্বীকৃত হল।

তার পর থেকে আনাগোনা করেছি নন্দনে[১], দুর্লভ স্নেহ ও সঙ্গ পেয়েছি। রূপকলা হাতে তো আসে নি, এসেছে মনে নানা রঙের আলো বিকীর্ণ ক'রে। আশা আছে— সব আলো মিলে মিশে এক শুভ্র উদ্ভাস তাও হয়তো দেখতে পাব কোনোদিন কোনো জীবনে। মনে পড়ে কত শীত ও হেমন্তের দুপুরে, নিদাঘের খরদাহে, নন্দলাল কাজ করতেন যে বাড়িটিতে তারই দেহলি-লগ্ন মধুমালতীর বিতানিত ছায়ার আশ্রয়ে থেকে, অবারিত খোয়াইয়ের শিয়রে দিগ্বলয়বনলেখায় আর উজ্জ্বল নীলাকাশে মগ্ন হয়ে গিয়ে, মনে হয়েছে— কী আশ্চর্য এই মুহূর্ত! অনশ্বর! চিরন্তন! মহাকালের জপমালায় গাঁথা অক্ষয় একটি গুটিকা! অত্যন্ত কাছে, উত্তরে ঐ দেখা যায় অট্টালিকাচূড়া, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি, অজস্র সৃষ্টিকার্যে তন্ময়। আর, এই পথ দিয়ে এখনই হেঁটে আসবেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ রূপকার ধূলিধূসর পায়ে। হেঁটে আসেন যখন হাঁটছেন ব'লে তো মনে হয় না, মনে হয় ধ্যান করছেন হাঁটতে হাঁটতে, যুক্তযোগী আরাধনা করছেন চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে। আসবেন যিনি, তাঁর কথাও শুনব, কাজও দেখব, নানা উপলক্ষে তাঁর স্নেহ ও প্রীতি লাভ করব, তাঁর প্রসাদে তাঁরই শিক্ষায় রূপরচনা করতে না পারি— রূপ দেখতে শিখব চোখ চেয়ে। দীপ্ত দুপুরের স্বপ্ন এ নয়, বাস্তব সত্যই।

এইটুকু বিস্ময়ের ভূমিকা ক'রে— কত যে বিস্ময় সে কি বোঝাতে পেরেছি?— গুরুপ্রণাম নিবেদন ক'রে, এখন শিল্পী নন্দলালের জীবন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

বসুপরিবারের পূর্ববাসস্থল ছিল তারকেশ্বরের কাছে জেজুর গ্রাম। পরে তাঁরা হাওড়া জেলায় রাজগঞ্জ ষ্টীমার-ঘাটের অদূরবর্তী বাণীপুরে এসে বাড়ি করেন, সরস্বতী নদীর ধারে। প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন বসু ফোর্ট্ উইলিয়ম তৈরির সময় ইঁটের জোগানদারি নিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন। শিবপুর থেকে দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তটে তাঁর ইঁটখোলা ছিল। লক্ষ্মী চঞ্চলা। প্রপিতামহের অর্জিত ধনসম্পদ্

পিতার আমল পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি। শ্রীনন্দলাল বসুর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু ডায়মন্ড্ হার্‌বার অঞ্চলে খাল কাটার কাজে পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে মুঙ্গের-খড়্গাপুরে খাল কাটানোর কাজ নিয়ে সপরিবারে বাস করেন। সে সময় রাজশেখর বসুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা এষ্টেটের অন্যতম নায়েব; খড়্গাপুর কাছারি ছেড়ে তিনি সদরে চলে যাওয়াতে পূর্ণবাবু কিছুকাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করেন। পরে তিনি চন্দ্রশেখর বাবুরই সুপারিশে দ্বারভাঙ্গা-রাজের স্থপতি নিযুক্ত হন। স্থাপত্যে নূতন নূতন রূপ -উদ্ভাবনে তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। অন্য দিকে শ্রীনন্দলাল বসুর মাতৃদেবী ক্ষেত্রমণি সুন্দর সুন্দর খয়েরের পুতুল, মিষ্টান্নের ছাঁচ, সূচিকর্মবিচিত্র কাঁথা —এসব রচনা করতে ভালোবাসতেন। প্রীতি ও ভগবদ্‌ভক্তি -পূর্ণ ছিল তাঁর উদার স্বভাব।

পূর্বোক্ত খড়্গাপুরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে (বাঙলা ১২৯০ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ) নন্দলালের জন্ম হয়। বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় খড়্গাপুরে ও দ্বারভাঙায়। বাল্যকাল থেকেই শিল্পানুরাগের এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, বালক নন্দলাল স্থানীয় কুমোরদের মূর্তিনির্মাণ দেখতে ভালোবাসতেন; তাদের দেখাদেখি নিজেও কাদামাটি নিয়ে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করতেন। গেঁহু ও ভুট্টার ক্ষেতে, প্রকৃতির অবারিত বক্ষে, খেলার সঙ্গীদের নিয়ে, তাদের নেতৃত্ব ক'রে, উৎসাহে উদ্দীপনায় সহজ আনন্দে যে দিনগুলি কেটেছিল তাতে গূঢ়প্রভাবসঞ্চারিণী, রূপময়ী, আনন্দময়ী প্রকৃতির যে 'পরশ' লেগেছিল বাল্যস্বভাবে, তা নিষ্ফল হয় নি— রূপরাগের অনুরাগে বালকের দেহমন ও ইন্দ্রিয় ধুয়ে ধুয়ে পরিস্কৃত সুন্দর করেছিল, ভাবী জীবনের ভূমিকা রচনা করেছিল সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রে ষোলো বছর বয়সে নন্দলাল আসেন কোলকাতায়। ক্ষুদিরাম বসুর স্কুলে বা সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে, কুড়ি বছর বয়সে এন্‌ট্রেন্স্ পাস করেন। একুশ বছর বয়সে হয় বিবাহ। এ দিকে, আরো লেখাপড়া করবেন বলে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিতে ভর্তি হতে হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি যুবক— জীবনের অবশ্যম্ভাবী মানচিত্রে ছকা আছে এন্‌ট্রেন্সের পর এফ-এ, তার পর বি-এ, তারও পরে এম-এ যদি বা না

জগাই-মাধাই
১৯০৯-১০

অজ্ঞাতবাসে অর্জুন ॥ জুলাই ১৯৩৬

হয়, ওকালতি, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারি, মাষ্টারি, আর তদভাবে সরকারি বা সওদাগরি আপিসে বিরস রুটিন-বাঁধা চাকরি। অথচ, কলালক্ষ্মী গোপনে যাকে বরণ ক'রে রেখেছেন তার কি কোনো সোয়াস্তি থাকে পুঁথি প'ড়ে আর পুঁথি মুখস্থ ক'রে? ক্ষুদিরাম বসুর স্কুলে যখন পড়েন, সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থে ছিল বীণাকর্ণ-চূড়াকর্ণ দুই বন্ধু আর এক মুষিকের গল্প। বিন্যস্ত পদাবলীর তাৎপর্য এবং ব্যুৎপত্তি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে না পারায় পণ্ডিতমশায়ের ভর্ৎসনা শুনেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু জল্পনাতৎপর দুই বন্ধু আর তণ্ডুলস্থলীর উদ্দেশে লম্ফনতৎপর এক ইঁদুর রঙ রেখা দিয়ে ছবিতে এঁকেছিলেন এ আমরা শুনেছি। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিতে তেমনি ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থের কবিতাবলী ছিল পাঠ্য; তারই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কবিতার পাশে পাশে নন্দলাল এঁকেছিলেন রঙিন ছবি। সে হয়তো অমর কবির অতুল রচনার উপযুক্ত ভাষ্যই হয়েছিল সর্বজনবোধ্য ভাষায়— চোখে দেখি নি, বইখানি কালাপানি পাড়ি দিয়েছিল গুণগ্রাহী রোটেন্‌ষ্টাইনের হাতে পৌঁছুবে ব'লে, যে কারণেই হোক আর ফিরে আসে নি। যা হোক, এভাবে মার্ক্ ওঠে নি তবু পরীক্ষার খাতায়। নইলে এফ-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবেন কেন? অথচ, যে-কোনো রকমে পাস না করলে নিস্তার কোথায়? পুনশ্চ ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটনে অর্থাৎ এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজে। যথাকালে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়েও ফেল করলেন। তখন অভিভাবকেরা চাইলেন বেলগাছিয়া আর-জি-কর মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি শেখাতে। সেখানে প্রবেশ মিলল না। ভর্তি হতে হল প্রেসিডেন্সি কলেজের কমার্শিয়াল ক্লাসে। মন পড়ে রইল অন্যত্র। পিসতুতো ভাই ছিলেন শ্রীঅতুল মিত্র, সরকারী আর্ট স্কুলে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান্‌শিপের ছাত্র। তাঁর শিক্ষায় তাঁরই দেখাদেখি অভ্যাস করা চলল মডেল ড্রয়িং, ষ্টীল লাইফ পেন্টিং, সস পেন্টিং। নাম লেখা রইল বটে কলেজের খাতায়— পড়াশোনা হবে কী, বই কেনা হল না ছ' মাসের মধ্যে, মাইনে দেওয়া হল না। সেই টাকায় ছবির বই ও সচিত্র সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন, কলেজ-পাড়ায় পুরোনো বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে ফিরে। ভালো লাগল রাফেলের আঁকা মাতৃমূর্তি, তারই নকল করলেন অখণ্ড মনোযোগে। রবিবর্মার ছবিও ভালো লাগল, তারই প্রেরণায় নিজে কল্পনা

করলেন মহাশ্বেতার রূপ। আদর্শানুকারী অতিপ্রকট ভঙ্গীতে ফুটে উঠল না হয়তো নিজস্ব প্রতিভা, কিন্তু রূপকলার অভিমুখে অনুরাগ ও আগ্রহ উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। একেবারেই তিক্ত আর ব্যর্থ মনে হল অর্থকরী বিদ্যার অধ্যয়ন, আরাধনা। অবশেষে স্থির সঙ্কল্প নিলেন মনে মনে — আর্ট্ স্কুলে ভর্তি হতে হবে অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে। ইতিমধ্যে ছাপা ছবি দেখেছেন তাঁর সাময়িক পত্রে – বুদ্ধ-সুজাতা, বজ্রমুকুট। মুগ্ধ হয়েছেন নবচিত্রকলার অভিনব ভাবলাবণ্যে। এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের একটি ছাত্রের মুখে শুনেছেন অবনবাবুর উদার মজলিশি স্বভাবের কাহিনী। গুরুবরণ হয়েই গেছে মনে মনে। কাজেই, সত্যেন বটব্যাল ব'লে এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের ঐ ছাত্রটিকে সঙ্গী করে একদিন হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সামনে।

অবনীন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলেন— 'কালোপানা একটি ছেলে'। স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়চাতুর্যে গম্ভীরভাব ধারণ ক'রে, সেই ছদ্মগাম্ভীর্যে সকৌতুক সহৃদয়তাকে প্রায় তিরস্কৃত ক'রে, কুঞ্চিত ভ্রূযুগে একপ্রকার কৃত্রিম ভর্ৎসনা ভঙ্গিত করে বললেন, 'কিছু হল না লেখাপড়ায়? স্কুল পালিয়ে তাই ছবি আঁকতে এসেছ?' আত্মঅভিজ্ঞতার কল্যাণে ধরে ফেলেছিলেন ঠিকই। স্কুল-পালানো ছেলে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ[২] উভয়েই। রসলোকের রূপ-লোকের এক-এক দিগন্ত আলো করেছেন আপন আপন প্রতিভাচ্ছটায়। আমার 'মাষ্টারমশাই' মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বাল্যে স্কুল পালাবার সুযোগ অথবা সাহস না পেলেও কলেজ পালিয়ে এসেছিলেন সত্যই। নন্দলাল ভয়ে ভয়ে বললেন এফ-এ পর্যন্ত পড়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বসে আছেন ভাইস প্রিন্সিপালের গদীতে, ঐটুকু মৌখিক আশ্বাসে তুষ্ট হলে চলে না— দেখতে চাইলেন এন্‌ট্রেন্স্ পাসের অভিজ্ঞানপত্র। অন্য একদিন নিয়ে আসবেন ব'লে নন্দলাল তো চলে এলেন। ছ মাসের মাইনে বাকি পড়ায় সার্টিফিকেট ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জব্দ। অনেক কাতরতা জানিয়ে, তথ্য হিসাবে ধোপে টেকে না এমন পাঁচ কথা সাজিয়ে ব'লে, করুণার্দ্র প্রাচীন কেরানিবাবুর অনুগ্রহে কিভাবে উদ্ধার হল সার্টিফিকেট, সে এক কাহিনী।

*

মোটের উপর পাওয়া গেল আর, পকেটে সার্টিফিকেট, বগলে ছবির তাড়া, আরএকদিন আর্ট্ স্কুলে পৌঁছে প্রিন্সিপাল হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গেও দেখা করতে হল। সাহেব ছবির তাড়া খুলে ফেলে মৌলিক ছবিই পছন্দ করলেন— মহাশ্বেতা। অন্য পাঁচ রকম কাজ, রাফেল প্রভৃতি নামজাদা পাশ্চাত্য শিল্পীদের ছবির নকল, টেবিলের এক ধারে সরিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঠেলতে লাগলেন। যেন অসাবধানেই, টেবিলের থেকে মেজেয় উপুড় হয়ে পড়ল সেগুলি। নন্দলাল তুলতে যেতেই, ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন হ্যাভেল। এ দেশকে আর এ দেশের শিল্পকে এত আপন করে নিয়েছিলেন এই ভারতপ্রেমিক মনীষী! এ দেশের মানুষ, এ দেশের ছেলে, এ দেশের চিন্ময় ঐশ্বর্যসম্ভার অবহেলা ক'রে অন্য দেশের মায়ামরীচিকার পিছনে ছুটবে, দ্বারে দ্বারে কাঙালপনা করবে, এ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, হ্যাভেল তাঁকে 'দিব্যচক্ষু' দিয়েছিলেন। হ্যাভেলের পরিচয় আরো যা পাই 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইখানাতে, অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথায়, উদ্‌ধৃত ক'রে দিলে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

'তার উপরে ছিলেন আমার হ্যাভেল গুরু। এ দেশের আর্ট্ বুঝতে এমন ছুটি ছিল না, রোজ দু ঘণ্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি-মূর্তির সৌন্দর্য, মূল্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন। হুকুম ছিল ⋯ ⋯ চাপরাশিদের উপর, ওই দু ঘণ্টা কেউ যেন না এসে বিরক্ত করে।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লা-কি ময়লা ছোটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥

ভাবি, সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন ক'রে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম, কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্পসৌন্দর্যের দিকে।'

যা হোক, নন্দলালের কাজ দেখে হ্যাভেল খুশী হলেন। দস্তুরমাফিক পরীক্ষাও করা হল নানা প্রকারে। ঈশ্বরীপ্রসাদ নন্দলালকে যাহোক একটা মন থেকে আঁকতে বলায়, আঁকলেন তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ অভিমত জানতে চাইলে স্বীকার করলেন পরীক্ষক— 'হাত পোক্ত

হ্যায়'। হাতের ড্রয়িং পাকা। মডেল ড্রয়িঙের পরীক্ষায় হরিনারাণবাবু টেবিলের উপর ঘটি বাটি পিরামিড আর ইজেলের উপর ঢাউস একখানা কাগজ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন 'সতেরো মিনিটমাত্র রয়েছে সময়— এঁকে ফেলো চট্‌পট্'। ছাত্র দেখলেন নির্দিষ্ট পনেরো মিনিটে বা সতেরো মিনিটে সমস্ত কাগজ জুড়ে কীই বা আঁকা যাবে, এক কোণে তিন-চার বর্গ ইঞ্চি ঘিরে নিয়ে পাঁচ মিনিটে সেরে ফেললেন। এ রকম ফাঁকির কাজে অসন্তুষ্ট পরীক্ষক নন্দলালকে নিয়ে গেলেন কর্তার কাছে; তিনি বললেন খুশী হয়ে, 'ছোটো হোক, ঠিকই তো হয়েছে। উপস্থিতবুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া গেছে বেশ।'

এখন, অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী তুমি শিখবে?' দেশী বিলাতি, শৌখিন ব্যবহারিক, জলরঙ তেলরঙ —শেখবার আছে তো অনেক। একটি বেছে নিতে হবে। তরুণ নন্দলাল এবারেও ঠকলেন না; তখনই উত্তর করলেন, 'আপনার কাছে এসেছি, যা শেখাবেন আপনি তাই শিখব।' প্রথম থেকেই আত্মসমর্পণ করলেন গুরুর পায়ে। আর, এই আত্মসমর্পণের ভাব শেষপর্যন্তই রক্ষা করে এসেছেন।

গুরুবরণ, গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ, নিরলস সাধনা —এ দেশের এই ধারা। সাধক, শিল্পী, নানা ক্ষেত্রের নানা প্রতিভাবান্ গুণী জীবনে এগিয়ে গেছেন এই ক'রেই— অবিনশ্বর সিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। একনিষ্ঠ সাধনার গভীর মর্মে একটি আত্মনিবেদনের ভাব থাকাতেই একার সিদ্ধি সকলের হয়েছে এবং ছোটো-আমি বড়ো-আমির বড়ো দায়িত্বের পথে রুখে দাঁড়ায় নি, বাধা ঘটায় নি পদে পদে। এই আত্মনিবেদনের কল্যাণে এইসব সাধু ও মনীষীর নিরভিমান জীবনে খ্যাতি-প্রতিপত্তির ও বিত্তের কাঙালপনা দেখা যায় নি। এইভাবেই ভারতের অধ্যাত্মসাধনা রূপকলা ও সঙ্গীত বড়ো হয়েছে, অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রকাশ এবং পোষণ করেছে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্পশিক্ষার্থী হয়ে যারা গেছে তাদের অনেককেই শুনতে হয়েছে— 'কেন এসেছ? এ পথ হয় বাদশার, নয়তো ফকিরের।' বাইরের বেশবাসে তফাত থাকলেও, যে বাদশাহ সেই ফকির— সেই যে-কোনো সাধনার অধিকারী। কারণ, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ এসব ঝুটা

জিনিষ সে চায় না, চাইবার দরকারও থাকে না। সিদ্ধিও কি চায়? সাধনার সিদ্ধি পদে পদেই, পুরস্কার হাতে হাতে; কোনো-একটা শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুবার অপেক্ষা থাকে না। সাধক যে, সাধনাটাই চায় সে একান্ত করে।

নন্দলাল আর্ট্ স্কুলে ভর্তি হলেন। এ দিকে তাঁর অভিভাবকেরা, বিশেষতঃ শ্বশুরকুল, তাঁর গতিবিধির সম্পর্কে দিশা পান না। নানা গুজবও হয়তো কানে গিয়ে পৌঁছুল। জামাই শেষে কি কালীঘাটের পোটো হবে? 'জামাই নাকি শ্মশানবাসী' সেইমতোই ভয়ের কথা এযে! মেয়ে দিয়েছেন, কাজেই স্থির থাকতে না পেরে নন্দলালের শ্বশুর এলেন সরজমিনে তদন্ত করতে। নন্দলালকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলেন কিনা জানি নে, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। অবনীন্দ্রনাথ বিধিমতে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন; আর্ট্ করেও উপায়-উপার্জন সংসার-প্রতিপালন হতে পারে যে, সেটা বোঝালেন। সব শেষে তিনি বললেন— 'আমি নন্দলালের সব ভার নিলাম।' শ্বশুর মহাশয় নিশ্চিন্তমনে ফিরে গেলেন।

তরুণ শিল্পী সাহস করে তখন চিঠি লিখলেন দাদাশ্বশুরকে, বারো দফা যুক্তি সাজিয়ে— কেরানি হবার বিদ্যা কিছুতে মনে ধরছে না নন্দলালের, হলেও মাসিক ষাট টাকার ঊর্ধ্বে কোনোদিন উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ, অপর পক্ষে ছবি এঁকে কম হলেও মাসিক একশো টাকা অবশ্যই উপার্জন করতে পারবেন। ইত্যাদি। অবশ্য, অনুমতি চেয়ে নিপুণ এই ওকালতির তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না তখনো। শ্বশুরকুল সনিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন যে, নন্দলালের ভাগ্যে নেই ইঞ্জিনিয়ার উকিল বা ডাক্তার হওয়া।

নন্দলাল প্রথমে ঈশ্বরীবাবুর ডিজাইনের ক্লাসে ভর্তি হলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ বিহারের (পাটনার?) কোনো চিত্রকর-বংশে জ'ন্মে ধারাবাহী চিত্ররীতিতে হাত পাকিয়েছিলেন এবং হ্যাভেলের মনোনয়নে আর্ট্ স্কুলের শিক্ষক-পদ পেয়েছিলেন। তাঁর ক্লাসে নন্দলাল ডিজাইন, অর্থাৎ আপন মন থেকে চিত্রকল্পনা, আর কারিগরি (বিশেষ ক'রে জেসো আর রঙিন কাঁচ কেটে নক্সা বানানো) সবই শিখতে লাগলেন। কিছুকাল পরে অবনীন্দ্রনাথ

INDIAN INSTITUTE OF ... STUDIES
Acc No. 9490
3.5.66

টেনে নিলেন তাঁকে নিজের ক্লাসে। অবশ্য, 'ক্লাস' সেই শুরু হল, নন্দলাল হলেন প্রথম ছাত্র। হ্যাভেলের প্রেরণে কাশী থেকে তাঁত শিখে ফিরে এসেছেন স্থরেন গাঙুলি। (দেশের চারু ও কারু -কলা উভয়েরই উজ্জীবন ছিল হ্যাভেলের অভীষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমটিতেই পড়ল বিশেষ ঝোঁক, তারই ক্ষেত্র তৈরি হল।) অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে এসে অচিরায়ু স্থরেন গাঙুলি হলেন তাঁর দ্বিতীয় ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'আমার ডান হাত আর বাঁ হাত'।

কিন্তু, সে কি ক্লাস? মাষ্টারির কোনো কথাই ছিল না সেখানে। ছিল একতান একমন সাধনা। সে সাধনায় গুরু-শিষ্য সকলেই মশগুল। অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, গল্প করছেন, ব্যাখ্যা করছেন, অজস্র আনন্দ ও উল্লাস বিকীর্ণ করছেন চতুর্দিকে, আর তাঁকে ঘিরে ছাত্রেরাও সকলে ছবি আঁকছেন, কথা শুনছেন, নিত্য নূতন বিষয় ভাবছেন ও বুঝছেন, রসবোধ ও রূপানুভূতির তড়িৎ-সঞ্চারিত পরিবেশে নূতন জীবন পান করছেন সকল সত্তা দিয়ে। নবস্থষ্টিক্ষণের অপূর্ব সেই আবহাওয়া উত্তরকালীন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও স্থকঠিন, ভাষায় ছ'কে দেওয়া কী ক'রে সম্ভব হবে? 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র কথকতায় অবনীন্দ্রনাথ কিছু আভাস দিয়েছেন মাত্র তাঁর নিজস্ব 'ওয়াশে'র ভঙ্গীতে। তাতে তথ্যের দিক দিয়ে জানতে পারি শিল্পের সহকারী প্রেরণা হিসাবে সাহিত্যচর্চাও চলেছিল পুরোদমে। অবনীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, সাহিত্যসাধনা আর শিল্পচর্চা ছুই নদীতেই কোটালের বান ডেকে এসেছে তাঁর— ছাত্রদের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল পুরাণেতিহাসের সরস কথকতা। একটা নূতন যুগের তরঙ্গচূড়ায় এগিয়ে চলেছেন তাঁরা, চেতন বা অবচেতন মনে তার খবর এসেছিল বৈকি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, অজন্তা ও বাঘ-গুহার আবিষ্কৃতি, স্বদেশী আন্দোলন, ওকাকুরা ও নিবেদিতার অভ্যুদয় —সমসাময়িক চরিত্র ও ঘটনাবলী মনের চোখে একবার দেখে নিলেই আজকের মানুষের পক্ষেও এ সত্য স্বতঃপ্রমাণিত হবে। এটাও মনে রাখতে হবে— প্রাচীন অতীতের অনুগমন ক'রে সহজে ও অবাধে এসে পৌঁছোয় নি শ্রদ্ধাশীল নতুন কাল। মাঝে গেছে অন্ধ অমারাত্রি, ভারতীয় হৃদয় বুদ্ধি চেতনার সাময়িক অবসাদ

ও মূর্ছা। কাজেই, ধর্মে ও সাহিত্যে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে, শিল্পেও তেমনি, এ হল নূতন দেহ-ধারণ ও নূতন প্রাণ-সঞ্চারের যুগ— নূতন উজ্জীবন। আত্মা চিরনূতন, চিরপুরাতন। মনে পড়ে অমর বিহঙ্গমের কাহিনী, সিন্ধুকূলে চিতা সাজিয়ে যুগে যুগে যে অগ্নিপ্রবেশ করে আর যুগে যুগেই দীপ্ততর নূতন দেহ নিয়ে উত্থিত হয়।

নব্য চিত্রকলায় পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য থেকে আংশিক প্রেরণা এসেছিল সন্দেহ নেই।[৪] কারণ, যুগ-যুগ-প্রবাহিত সেই ভাবজাহ্নবী বয়ে চলেছিল লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে, জীবনযাত্রার পাশাপাশি। তাতে অবগাহন করা, তা থেকে চিত্তস্ফূর্তি লাভ করা কিছুই কঠিন ছিল না। রসায়িত চিত্তের সেই স্ফূর্তি থেকে, রক্তধারাধাবিত সহজাত ধ্যান থেকে, ছাত্র নন্দলাল প্রথম আঁকলেন— বাণাহত হাঁস কোলে ক'রে সিদ্ধার্থ। পরে আঁকলেন দশরথের মৃত্যু, কালী, সত্যভামা-কৃষ্ণ, কর্ণ, জগাই-মাধাই, শিবের তাণ্ডব, সতী, শিবসতী, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, এমনি আরও অনেক ছবি। হ্যাভেলের সংগৃহীত প্রাচীন ছবি ক্লাসেই ছিল, যাদুঘরে স্থান পায় নি তখনো। নন্দলাল তার মধ্যেও চার-পাঁচখানির নকল করেন। পূর্বোক্ত তালিকার অনেকগুলি ছবিই অল্পবিস্তর পরিচিত। ভগিনী নিবেদিতা প্রথম যেদিন আর্ট্ স্কুলে এসে নন্দলাল প্রভৃতির পরিচয় নেন, সেদিনের স্মৃতি আচার্যের মনে আজও উজ্জ্বল। দশরথের মৃত্যু, কালী, সত্যভামা-কৃষ্ণ —তিনখানি ছবি সম্পর্কে তিনি কিছু কিছু মন্তব্য করেন। মুমূর্ষু দশরথকে তালপাখায় ব্যজন করানো হচ্ছে দেখে বলেন এ পাখা রাজভবনে মানায় কি? ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যের দ্যোতক কারুকলাদি দেখা উচিত! কালীকে কটিবাস দেওয়াতে বলেছিলেন কালীর যে ধ্যান-ধারণা যুগ যুগ ধ'রে প্রচলিত, তার সঙ্গে সঙ্গতি হয় না। কালী করালরূপিণী, নগ্নিকা, অথচ ভক্তের কাছে বরাভয়দায়িনী বিশ্বজননী। ব্যবহারিক জ্ঞান-বুদ্ধি সহায় করে মায়ের এই অপূর্ব রূপ ও চরিত্র ধারণা করা যায় না। ভগিনী বিশেষ বিচলিত হন শেষোক্ত ছবিটি দেখে। সত্যভামার পায়ে ধ'রে মান ভাঙাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এই ছিল ছবির বিষয়। নিবেদিতা অত্যন্ত জোর দিয়ে, অত্যন্ত আবেগভরে বললেন— 'এমন পৌরুষনাশা কল্পনা কখনো

কোরো না। পুরুষ স্ত্রীলোকের পায়ে পড়বে কী!' এই উক্তিতে যেমন বোঝা যায় নিবেদিতার চরিত্রগত তেজ, তেমনি পরিস্ফুট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বাঙালিসুলভ এই ভাবালুতার সাধক আর যে-খুশি হোক, নন্দলাল যে নন, তাতে আর ভুল কী? পৌরুষ, গাম্ভীর্য, গভীরতা, শান্তি, সংযম ও উদাত্ত ভাবই যে নন্দলালের পক্ষে সহজ, স্বাভাবিক, এ কথা মনস্বিনী ঠিকই বুঝেছিলেন আর সেই দিকেই নন্দলালকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই রেখাঙ্কনের কতদূর উৎকর্ষে পৌঁচেছিলেন শিল্পী, জগাই-মাধাই ছবিটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি হুঁকো আছে, শ্রীচৈতন্যের আমলে তার সম্ভাবনা ছিল না, এরূপ মন্তব্য করেও নিবেদিতা ছবিটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।[৫] ছাত্রাবস্থায় আঁকা ছবির ভিতরে 'সতী' ও সতীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে শিব বা 'শিবসতী' সঙ্গত কারণেই সর্বজনপরিচিত হয়েছে। সতী সম্পর্কে চমৎকার গল্পও পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের উক্তিতে। প্রতিচিত্র তৈরির জন্যে জাপানে আসতে-যেতে কেমন ক'রে তা বিবর্ণ হয়ে যায়, কেমন ক'রেই বা অগ্নিশুদ্ধ হেমাভা তার ফিরে আসে। অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব কথকতায় তথ্যের কিছু হেরফের আছে সত্য, তা থাক্।

সতী, শিবসতী, জগাই-মাধাই, শিবতাণ্ডব, এই রকম অল্প কয়েকখানি ছবিও স্মৃতির মন্দিরে সাজিয়ে নিলে অর্থহীন মনে হয় না এই সেদিনও আচার্য যা বলছিলেন— 'একজন আর্টিষ্ট্ জীবনে অল্প কয়েকখানি ছবি আঁকেন; অসংখ্য কাজের ভিতর থেকে ঠিক ঠিক তিন-চারখানি বেছে নিতে পারলেও তাঁকে সম্পূর্ণ জানা যায়, পাওয়া যায়।' অর্থাৎ, বিশেষ প্রতিভার বিশিষ্ট যা স্বরূপ, তা অল্পেই ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে এ কথাও যোগ করে দিই— আদিপর্বেও ধরা পড়ে যায়। যথার্থ যে রসিক তার পক্ষে 'প্রভাত-সঙ্গীত' আর 'মানসী'র কয়েকটি কবিতা থেকে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকেও, বিরাট বিশাল বিচিত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌দেশের জ্ঞান তথা আদিগন্ত সমীক্ষণ অসম্ভব নয়। তেমনি নন্দলালের পূর্ণ প্রতিভার জাজ্বল্যমান ছাপ তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনাকালীন কাজেও পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তা ব'লে রবীন্দ্রনাথের মানসী বা প্রকৃতির প্রতিশোধ নিয়েই আমাদের সন্তোষ হ'ত না নিশ্চয়। তেমনি শিল্পী নন্দলালেরও প্রায় অর্ধশতকের অনলস সাধনার

অজস্র দান, জাতি বা যুগ তার কিছুই ফেলতে চাইবে না। কারণ কী? শুধু গভীরতা গম্ভীরতা নয়, সারের সার বস্তুটি নয় শুধু— আর্টে রয়েছে বিস্তার, বৈচিত্র্য, এমন-কি বিপুলতারও যথেষ্ট মূল্য। নইলে অজর অমর ঐশ্বর্যও মর্তে যথোচিত প্রতিষ্ঠা পায় না, তার ভার থাকে না, যেনবা সকলের গোচরীভূত হয় না, স্থায়ী হয় না— এসে ফিরে যায় অনন্তে, শাশ্বতে। আরএক কথা এই যে, রূপের যা স্বরূপ, ছন্দের যা অন্তঃস্পন্দন, ভাবেরও যা অনুস্যূত অনুভাব— প্রায় অপরিবর্তনীয় বলা যায় শুধু সেইটিকেই। এক-এক প্রতিভার বিকাশে, এক-এক চরিত্রভঙ্গীতে, তা এক-এক প্রকার। সেইটি অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রেখে দেহের ও পরিচ্ছদের, বর্ণের ও প্রসাধনের, আবেদনের ও ব্যঞ্জনার বহু পরিবর্তন হয়— সেটিও পরম লোভনীয়। নূতন নূতন বিষয়, নূতন কালের নূতন ঘটনা ও সমস্যা -রাজি, আর্টের নূতন করণ উপকরণ ও আশ্রয়, যেমনি উপস্থিত হয় শিল্পীর সামনে— শিল্পীকে আহ্বান করে ক্রীড়ায় অথবা ছল ক'রে স্পর্ধা দেখায় পথরোধের— অমনি একই প্রতিভা বহুধা বিচিত্র হয়। সে এক কৌতুক, সে এক বিশেষ সার্থকতা। যেমন তা রবীন্দ্রনাথের জীবনে, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে, তেমনি আবার নন্দলালের রূপকৃতিতে বারম্বার প্রমাণিত হয়েছে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সহজ সরল ক'রে বললে এই তো দাঁড়ায়— যে মুহূর্তে 'সতী' রূপ নিল আবিষ্ট তূলির টানে ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে, অমনি চিরকালের নন্দলালকে পাওয়া গেল, নন্দলালের বিশেষ প্রতিভাকে। সহৃদয় জনের হৃদয়গোচর ও নয়নগোচর হল। অথচ, হয়তো এ ছবি তাঁর প্রথম বৎসরের কাজ।

সিদ্ধার্থের ছবি, আর্ট্ স্কুলে নন্দলালের যেটি আদিম কল্পনা, সেটিতে হাঁটুর চাকি আঁকা হয়েছিল গোলাকারে। অবনীন্দ্রনাথ সেই অ্যানাটমি-অশুদ্ধ ড্রয়িং শোধরাতে উদ্যত হলে মনীষী হ্যাভেল বাধা দিয়ে বলেন— ঠিক হয়েছে, বড়ো সুন্দর হয়েছে, কেননা, ছবিটির আদ্যন্ত আলংকারিক রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে। একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে হ্যাভেল তাবৎ ভারত-শিল্পের অন্তর্নিহিত মণ্ডনগুণের যেমন পরিষ্কার ধারণা করতে পেরেছিলেন, তেমনি বুঝেছিলেন ঐ বিশেষ গুণেই নন্দলালের প্রতিভা বিশেষভাবে

ভারতীয়, অর্থাৎ ভারতশিল্পের ধারাবাহী। কিন্তু কেবল আলংকারিকতা নয়, ভারতশিল্পের ধ্রুবপদী রূপ যেটি তাতে ফুটে উঠেছে আবার বিশালতা এবং এক প্রকার প্রতীকী বাস্তবতা। নিছক আলংকারিকতা পারস্যশিল্পেও আছে, প্রাচ্য যে-কোনো 'চিকন' কাজে বা 'মিনিয়েচার' ছবিতেই আছে— ফলে বিশালতা ও বাস্তবতা নিরস্ত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অজন্তায় বা বাঘগুহার কাজে তা হয় নি। নন্দলালের ছবি দেখে হ্যাভেল বুঝেছিলেন, মনে হয়, এ দিক দিয়েও নন্দলাল ভারতশিল্পের যোগ্য উত্তরাধিকারী। কোনো-এক উপলক্ষে বলেছেন মনে পড়ছে— বৃহৎ পটভূমি পেলে, ভিত্তিচিত্রাদির রূপ নিলে, তবেই নন্দলালের চিত্রণদক্ষতার পরিসীমা ও রূপসৃষ্টির স্বরূপবোধ সম্ভব হবে। বিরল সুযোগে ও অল্প কয়েকটি কাজে শিল্পী নন্দলাল উত্তর জীবনে ঐ ভবিষ্যদ্‌বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণিত করেছেন বটে, আরও ব্যাপক ক্ষেত্র, আরও স্থায়ী আশ্রয় পেলে কী রূপৈশ্বর্যে এ দেশ এই যুগ ঐশ্বর্যশালী হতে পারত তা কেবল অনুমানের ও নিরাশ কল্পনার বিষয় হয়ে রইল। অল্পপরিসর কাগজে কাঠে কাপড়ে যা এঁকেছেন শিল্পী, সেও অনেক সময়েই স্বরূপতঃ বৃহৎ জানি ; কিন্তু বৃহৎকে বৃহৎরূপে দেখবার সৌভাগ্য হল না আমাদের।

আর্ট্‌ স্কুলে নন্দলাল পাঁচ বছর ছিলেন ; বেতন দিতে হয় নি, বরং বছর দুই পরে মাসিক বারো-তেরো টাকা হিসাবে বৃত্তি পেয়েছিলেন —এই তথ্য দিয়েছেন শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।[৬] পাঁচ বৎসর আর্ট্‌স্কুলে ছিলেন কলা ও কারু নিয়ে নূতন এক সৃজনবেদনার বৈদ্যুতিক আবহাওয়ার মধ্যে। হাতে ধ'রে অবনীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন অল্পই, কিন্তু তাঁর শিল্পসৃষ্টির ধারা-ধরণ, তাঁর রসাবিষ্ট চিত্তের স্পর্শ, তাঁর সাধনা, তাঁর জীবন ও চরিত্র, প্রভাব বিস্তার করেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে সকল ছাত্রের অন্তরে, আর সব থেকে নন্দ-লালেরই শিল্পীজীবনে। তবে, অচিরায়ু সুরেন গাঙুলির প্রসঙ্গ বাদ দিলে বলতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে প্রভাব হয়েছে সর্বনাশা, নয়তো অচিরস্থায়ী, নয়তো ভাসা-ভাসা, একমাত্র নন্দলাল নিয়েছেন তার স্পিরিট— কায়া বা মায়া নয়, যথার্থ ভাব— ফলে আপন মৌলিকতা বিসর্জন দেন নি, বরং দিনে দিনে তাকে চিনে নিয়েছেন, তাকে দৃঢ় করেছেন, তাকে পুষ্ট করেছেন।

অথচ, পরিণত বয়সেও তিনি বলেছেন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রীতিতে নত হয়ে, 'অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমায় শিল্পের ভুবনে। আমি তাঁর শিষ্য, আমি তাঁর পুত্রেরই মতো।'

এই সময়েই কলালক্ষ্মীর ধ্যানধারণার অনুকূলে আরও এক শিল্পসমজদার ভাবুকের অনুজভাব ও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নন্দলাল, তিনি হলেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা। আর্টের গভীর মর্ম, কোথায় তার মূল প্রেরণা, কিসে তার স্বতঃসিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা, নন্দলাল ও শৈলেন দে'র সঙ্গে এসব নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার ফলস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা -সহ একখানি বই লেখা হয় ইংরেজিতে।

নন্দলাল আর্ট্ স্কুলের শিক্ষা শেষ করলেন যখন, তার পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ সেখানকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন। পার্সি ব্রাউন তখন প্রিন্সিপাল, তিনি নন্দলালকে বললেন আর্ট্ স্কুলেই কাজ করতে, চাকরি নিতে। এ দিকে অবনীন্দ্রনাথ ডাকলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে কাজ করবার জন্য। বলা বাহুল্য কোন্ ডাকে নন্দলাল সাড়া দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছাত্রকে মাসিক ষাট টাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়েছিলেন তিন বৎসর। শুনেছি এই সময়েই নন্দলাল ভগিনী নিবেদিতার Myths of the Hindus and Buddhists বইখানির ছবি আঁকেন। প্রাচ্য-শিল্পবেত্তা কুমারস্বামী আসেন গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে। ঠাকুর-শিল্পসংগ্রহের তালিকাপ্রণয়নে নন্দলাল তাঁকে সাহায্য করেন, বহু পুরাতন ড্রয়িং বা রেখাচিত্রের নকল করে দেন তাঁরই অনুরোধে। সে সময় ঠাকুরবাড়ি ছিল তীর্থবিশেষ— বহু দিগ্‌দেশ থেকে সেখানে এসে মিলেছে বহু মনীষার ধারা। ওকাকুরা প্রথম এসেছেন সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে, নন্দলাল তখনো স্কুলে বা কলেজে। নন্দলাল আর্ট্ স্কুলে ভর্তি হয়েছেন যখন তার পূর্বেই ওকাকুরার নির্দেশে এসেছিলেন জাপানী শিল্পী হিশিদা ও টাইকান— জাপানে ফিরে চলেছেন। ওকাকুরা আবার পাঠিয়ে দেন খার্‌সুতা ও কিরিটান এই দুই শিল্পীকে অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। অতঃপর দ্বিতীয়বার স্বয়ং ভারতভ্রমণে এসে আর্ট্ স্কুলের তরুণ চিত্রকর-গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। কিছু উপদেশ চাওয়ায় জিজ্ঞাসা করেন— কার কত বয়স। জন্মকাল

খতাতে দেখে বললেন, তা নয়, কে কতদিন ছবি আঁকছে। কেউ দু বছর, কেউ তিন বছর। ওকাকুরা বললেন— 'এখনো সময় হয় নি। আবার আসা হয় তো তখন বলব।' তখনকার মতো সুরেন গাঙুলি, নন্দলাল প্রভৃতি ছাত্রের ছবি দেখে দেখে মন্তব্য করলেন— বাতিল ছবি এক-একখানি ধ'রে সংক্ষেপে বোঝালেন কেন নষ্ট হল ছবি। 'কালীদিঘির পাড়ে ইন্দিরা' দেখে বললেন, ছবি ভালো হলেও বর্ণ আবিল হয়েছে।

ওকাকুরার সঙ্গে নন্দলালের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এর পরে পুনরায় যখন এ দেশে আসেন, বক্তৃতা দেন নি, বিস্তৃত আলোচনা করেন নি, তবু যেটুকু বলেছেন, বুঝিয়েছেন, ইঙ্গিত করেছেন, বাংলার নূতন শিল্পগোষ্ঠীতে, অন্তত নন্দলালের শিল্পীজীবনে, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুভ ও সুদূরপ্রসারী। ওকাকুরার সঙ্গে এই শেষ দেখাশোনা। এ সময় তিব্বতে চলছিল লড়াই। ওকাকুরাকে কথাপ্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করেন, জাপানীরা ভারত অধিকার করলে কী হবে ? ওকাকুরা বলেন— 'কোনো কল্যাণ হবে না। অতি প্রাচীন ও অভিজাত ভারতের সংস্কৃতি। জাপানীরা বর্বর, ভুঁইফোড় (upstart) ; হয়তো গায়ের জোরে এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলবার দুশ্চেষ্টায় লেগে যাবে।' পাশ্চাত্যঅভিমুখিতা, পাশ্চাত্য শক্তিউপাসনার অনুকৃতি, জটিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থূল লক্ষণগুলির আহরণ, বিজিগীষা, প্রাচ্যভাবের ক্রমিক পরিহার— যা দেখতে দেখতে জেগে উঠছিল নবীন জাপানে, তাতে যে ওকাকুরার হৃদয়বুদ্ধির সায় ছিল না, বিশেষ বেদনাই ছিল, দৃষ্টিও ছিল মোহমুক্ত, তারই প্রমাণস্বরূপে এ কথার উল্লেখ হল। ভারতভারতীর কেমন ছিলেন মর্মজ্ঞ ভক্ত সেও বোঝা যায় যখন শুনি বার বার বলেছেন তিনি— এ দেশ ভাস্কর্যের— দুরূহ ও তপঃসাধ্য মূর্তিকলার পুনরুজ্জীবন না হওয়া পর্যন্ত, সাধারণভাবেও ভারতীয় শিল্পকলার নবজীবনলাভ বললাভ ঘটে উঠবে না, পরমোৎকর্ষে পেঁছিনো অসম্ভব হবে। কথা মিথ্যা নয়, আর আচার্য নন্দলাল অন্য যুগে অন্য অনুকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলে মূর্তিকার হতেন যে, সে বিষয়েও তাঁর বা আমাদের সন্দেহ নেই।

ওকাকুরার কথা এই পর্যন্তই। কেমন অলক্ষ্যে কী প্রভাব তিনি বিস্তার করেছিলেন নবভারতের শিল্পে (তা ছাড়া রাজনীতিতে) তার কতক কাহিনী

অবনীন্দ্রনাথও বলে গেছেন। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বসে স্মরণ করেছেন কিভাবে জাপানের শিল্পে আর ভারতের শিল্পে তথা উভয় দেশের শিল্পীতে শিল্পীতে হৃদয়বিনিময় হল, ভাববিনিময় হল, কবে কোথা থেকে সৃষ্টি হল— ধোওয়াট রঙে, ধুয়ে ধুয়ে, ছবি আঁকার অভিনব পদ্ধতি। কৌতূহলী পাঠক পূর্বোক্ত বই থেকেই প'ড়ে নেবেন। বর্তমান প্রসঙ্গে অধিকন্তু এটুকু যোগ করা যেতে পারে— আরও পরবর্তীকালে 'বিচিত্রা'ভবনে এসে থাকেন আরাইসান্। নন্দলাল-প্রমুখ শিল্পীরা তাঁরই ক্লাসে শেখেন জাপানী চিত্রণ-রীতি, কালী-তূলির কাজ।

প্রতিভার বয়ঃসন্ধিকালে, তার বিকাশ ও মজবুত গড়নের অনুকূলে, আর যে-কয়েকটি ঘটনা ঘটে, নিশ্চিত পারম্পর্য না জানলেও তারও উল্লেখ করে রাখি এইখানে। 'শিবসতী' ছবিটি সোসাইটি বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে দেখানোর পরে শিল্পী পাঁচ শো টাকার একটি পুরস্কার লাভ করেন এবং স্বামীজির সহপাঠী প্রবীণশিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে সঙ্গী লাভ ক'রে ঐ টাকায় পাটনা গয়া কাশী আগ্রা দিল্লি মথুরা ঘুরে, সেসব স্থানের শিল্প-কীর্তিগুলি তন্ন তন্ন ক'রে দেখে, শেষে বৃন্দাবনে এসে কিছুকাল বাস করেন। এইভাবে উত্তরভারতের ধারাবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভালোরকম পরিচয় হয়। তেমনি দক্ষিণভারতের অতুল শিল্পৈশ্বর্য দেখবেন ব'লে বেরিয়ে পড়েন শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅলীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্যে। শ্রীক্ষেত্র থেকে কাঞ্চী অবধি সব তীর্থনগরীগুলি দেখা হয়; কেবল বাকি থেকে যায় ভারতীয় মূর্তিকলা ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠনিদর্শনরূপী কোণার্কমন্দির। শিল্পই যার দেবতা, রূপ-রচনাই যার আরাধনা, রসানুভূতিই একমাত্র লভ্য— ইহলোকেই, কোনো পরলোকে নয়, আর পাপপুণ্যের জমা খরচের কোনো খতিয়ান কেটে নয়— তেমন মনের মতো সঙ্গী পেয়ে কোণারকে গিয়েছিলেন ঠিক কোন্ সালে কোন্ তারিখে তা অনুসন্ধানের বিষয় হলেও, কী দেখেছেন, কী পেয়েছেন, আজও জ্বল্ জ্বল্ করছে তা শিল্পীর স্মৃতিতে। সপরিবারে গিয়েছিলেন সপ্তাহের রসদ নিয়ে, শিশুপুত্রও বাদ যায় নি। সঙ্গে ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর আর জাপানি চিত্রকর আরাইসান। শেষোক্ত ব্যক্তিটি মাতৃভাষা ছাড়া

কিছুই জানতেন না। কাজেই সমুদ্রের দুই পারের দুই শিল্পী আলাপ জমাতেন আকারে ইঙ্গিতে আর দরকার হলেই চিত্র এঁকে এঁকে, অর্থাৎ সর্বজনীন ভাষায়। তাতে কথা তো হ'তই, তা ছাড়া কৌতুক ছিল প্রচুর। কোণারকের রাস্তায় দেখলেন যূথচারী হাজার হাজার হরিণ— বিজাতীয় জীবের সাড়া পেয়ে শৃঙ্গীগুলি সব নিমেষে কান খাড়া করে শিঙ উঁচিয়ে দাঁড়ালো ব্যূহ বেঁধে, হরিণী আর হরিণশাবকগুলি অনেক দূরে চলে গেলে কে যে তাদের 'রাইট অ্যাবাউট টার্‌ন্'এর হুকুম দিল অনুচ্চারিত ভাষায়, সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে বিদ্যুদ্‌ভঙ্গীতে দিল ছুট।

সব শেষে যে ঘটনা উল্লেখযোগ্য সে হল— ইংরেজি ১৯০৯ সালে বিলাত থেকে লেডি হেরিংহ্যামের আগমন, অজন্তা গুহাচিত্রের নকল করতে। ভগিনী নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথকে বললেন নন্দলাল, অসিত হালদার প্রভৃতিকে তাঁর কাজের সহকারী ক'রে পাঠাতে। শুধু বলা নয়, সকলের সব দ্বিধা আপন দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তিতে ঠেলে ফেলে, নিশ্চিন্ত হলেন না যেপর্যন্ত নন্দলালদের পাঠানো না হল। অনভিজ্ঞ যুবকদের সঙ্গ দিতে পরে গণেন ব্রহ্মচারীকেও পাঠিয়ে দিলেন। আর আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও একদিন উপস্থিত হলেন ভারতশিল্পের সেই অম্লানদ্যুতি পুণ্যতীর্থে। বৃদ্ধা হেরিংহ্যাম যে নিষ্ঠা, যে শ্রদ্ধা, যে দক্ষতা নিয়ে কাজ করেছিলেন অজন্তা-চিত্রের প্রতিলিখনে, তার যা শিক্ষা, আচার্য নন্দলাল আজও তা স্মরণ করেন। বলা বাহুল্য— সমাগত শিল্পীদের, বিশেষতঃ নন্দলালের, ধারাবাহী ভারতচিত্রকলার পরিচয় অজন্তাচর্যার ফলেই পূর্ণ হল, দৃঢ় হল, অন্তরঙ্গ হল। এরও বহুদিন পরে ইংরেজি ১৯২১ সালে গিয়েছিলেন বাঘ গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল নিতে। ভারত-চিত্রকলার প্রকৃষ্ট পরিচয়ই সেখানে পাওয়া গেল সত্য, একান্ত নূতন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। 'বাঘ গুহার অভিজ্ঞতা' নন্দলালেরই মুখের কথায়, কৌতুকদীপ্ত ভঙ্গীতে, ১৩৪৮ আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রে মুদ্রিত রয়েছে।

আর্ট্‌ স্কুল -উত্তীর্ণ নন্দলালপ্রমুখ তরুণ শিল্পীরা এক সময় স্থির করলেন তাঁরা সপরিবারে একত্র থেকে একত্র শিল্পসাধনা করবেন, একত্র অর্থসঞ্চয় করবেন এবং যার যার প্রয়োজন -মত ব্যয় করবেন— হবে যেন একান্নবর্তী

একটি বৃহৎ পরিবার বা সঙ্ঘ বা মঠ্। বাড়িও একটি দেখা হল। কিন্তু কত দূর কী গড়ে উঠত শেষ-বেশ জানা গেল না এইজন্যই যে, এই সময়েই ইংরেজি ১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা' সভা স্থাপিত হল এবং সেই সভায় যোগ দিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ডাক দিলেন। নন্দলাল, অসিতকুমার, মুকুল দে ও সুরেন্দ্র কর, বিচিত্রার শিল্পী হিসাবে প্রত্যেকে মাসিক ষাট টাকা হারে বৃত্তি পেতে লাগলেন। জাপানী শিল্পী আরাইসান এই বিচিত্রারই অতিথি-রূপে ছিলেন এবং নন্দলাল প্রভৃতির সঙ্গে কোণারক-দর্শনে গিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

'বিচিত্রা' বেশিদিন স্থায়ী হল না। রবীন্দ্রপুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর শিল্পশিক্ষার ভার পেলেন নন্দলাল। বাণীপুরে আপন বাড়িতে থেকে কোলকাতায় যাওয়া-আসা করেন। সেই সময়েই, ইংরেজি ১৯১৯ সনে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরে এঁকে দেন মহাভারতের ছবি এবং অন্যান্য ছবি। স্বগ্রামে থাকতে থাকতেই পিতৃবিয়োগ হয়। কিছুকাল সোসাইটিতে বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীতে শিল্পশিক্ষার্থীদের আচার্যরূপেও কাজ করেন। মাঝে মাঝে যান শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ে। কবে যেন এই প্রাণের যোগই কাজের যোগ হয়ে তাঁকে ধরে রাখল— খাতাপত্রের ভাষায় বলতে হলে, কলাভবনের অধ্যক্ষপদে, আসলে তার গুরুর পদে, তারই প্রাণের প্রাণ হিসাবে। ধীরে ধীরে আচার্যের জীবনসাধনার মহিমান্বিত উত্তরপর্ব উদ্ঘাটিত হতে থাকল; তাঁর গুরুগোষ্ঠী, তাঁর মিত্রগণ, তাঁর পুত্র-স্থানীয় শিষ্যগণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখল— দেখে আনন্দিত হল, নইলে 'অলক্ষ্যে'ই বলা চলত— খবরের কাগজে কাগজে অসময়ে কোনো রকম রটনা হয় নি তার।

১৩২১ সালের পুণ্য বৈশাখে শ্রীনন্দলাল বসু প্রথম এসেছেন সেই আশ্রমপদে যেখানে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন, এসেছে বহু মানবের ধারা, বহু সাধনার— আসবে কালে কালে। ইষ্টকঅট্টালিকা, কংক্রিটের গাঁথুনি, আজ যা আছে কাল তা রাখবে না— থাকবে হয়তো আশ্রমবীথিকার শালপুষ্পোচ্ছ্বসিত আকাশ,

মাধবী মালতী ও সপ্তপর্ণীর সৌরভবীজিত সমীরণ, আর, চিরন্তন রাঙা ধূলি— কবি যাকে বলেছেন 'তোমার পথের রাঙা ধূলি'। কার, কবিই তা জানতেন আর কচিৎ কেউ জেনেছেন, হয়তো জানবেন কালে কালে।

গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে আশ্রমবাসী গুরু শিষ্য মিলে অভিনয়অনুষ্ঠান ছিল 'অচলায়তন' নাটকের। কাঙ্ক্ষিত অতিথি নন্দলালকে পেয়ে অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করলেন কবি, আশিস্ বর্ষণ করলেন তাঁর সন্নত শিরে। রবিকর-প্রোজ্জ্বল সকালবেলায় সেই অনুষ্ঠানটির শেষে— এখন যেখানে শিশু-বিভাগ তার সম্মুখীন কালাচাঁদবাবুর বাড়িতে নির্দিষ্ট হয়েছিল নন্দলালের স্থান— শিল্পী এসে দাঁড়ালেন কুটীরদ্বারে, আশ্রমের প্রীতিঅর্ঘ্য তখনো রয়েছে তাঁর বদ্ধাঞ্জলিতে। হঠাৎ মনে হল দেহ থেকেও তো নেই, জড়বাধা কোথায় অপসৃত হল! আলো হাওয়া চলে যাচ্ছে শরীর ভেদ ক'রে! অভূতপূর্ব আনন্দে আপ্লুত হল চেতনা। আচার্য বলেন— আজও তার রেশ বাজছে জীবনে। মহর্ষি কি অলক্ষ্য আশীর্বাদে স্পর্শ করলেন শিল্পীকে? নিলেন তাঁকে আশ্রমের নিগূঢ় অন্তরে?

শ্রীঅসিতকুমার হালদার ছিলেন আশ্রমবাসী। নন্দলালও ফিরে ফিরে আসেন আন্তরিক টানে, কিছু কাল থাকেন, কাজ করেন, আবার চলে আসেন কোলকাতায় অথবা স্বগ্রামে। ক্রমশ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে যতই রূপ নিতে লাগল কলাভবন, কবি প্রথমে টেনে নিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'কে। পরে একদিন জোড়াসাঁকোয় এলেন। নন্দলাল ধূমাবতীর ছবি আঁকছেন একমনে, কখন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালেন আর আস্তে আস্তে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বললেন— 'নন্দলাল, তুমিও চলো।' বলাই বাহুল্য, খুশী হয়ে নন্দলাল সাড়া দিলেন কবির আহ্বানে। এই ঘটনার দিনক্ষণ, কত কাল রইলেন আশ্রমে, 'সোসাইটি'র অধীনে কবে প্রতিষ্ঠা হল শিল্পবিদ্যালয়ের, গুরু অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে কবেই বা ফিরে আসতে হল কোলকাতায়— শিল্পীর স্মৃতিতে নেই তার সন-তারিখ, নেই কোনো কালগত পরিমাণ। এ কথা খুবই মনে আছে তবু, কবি সহজে আসতে দিতে চান নি নন্দলালকে। নন্দলালও ফিরে এসেছিলেন একান্তই গুরুআজ্ঞাবশে। খুড়ো-ভাইপোর মধ্যে অনেক লেখালেখি হল, শেষে রবীন্দ্রনাথ এই মর্মেই লিখেছিলেন—

উমার ব্যথা । ১৯২১

হলকর্ষণোৎসব ॥ অংশ ॥ জানুয়ারি ১৯৩০

'সরকারী সাহায্য বিষময়, সরকারের প্রসাদপুষ্ট হয়ে স্থায়ী হবে না সোসাইটি, হতেও পারে না, অথচ এখানে আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে, অবন, তুমি তার চূড়ো ভেঙে দিলে।'

কয়েক বৎসর গেল। শেষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গুরু অবনীন্দ্রনাথের আজ্ঞা পেয়ে নন্দলাল স্থায়ীভাবে এলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। কলা-ভবনের অধ্যক্ষপদে এলেন এ কথা বললে হবে উনোক্তি। শান্তিনিকেতন-আশ্রম, দু চোখের কাছে যার অবারিত দূরদিগন্ত পর্যন্ত সীমা, মনে যার কোনো দিকেই কোনো সীমা নেই— সব দেশ আর সব যুগেই যেন ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে দিনে দিনে— সেই আশ্রম, সেই বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিই কোলে করে নিয়েছে শিল্পীকে। আর, শিল্পীও আপন করেছেন— আত্মসাৎ করে চলেছেন তাকে প্রতিদিনের তপস্যায়, আশ্চর্য ও অজস্র রূপকৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আর্ট্‌-স্কুল চালাতে আহ্বান করেন নি। 'এসো তুমি এখানে, এখানে থেকে সাধনা করো, সৃষ্টি করো' —এই ছিল তাঁর একমাত্র দাবি। নিজেও তিনি ভুবনবরেণ্য শিল্পী, স্রষ্টা। সৃষ্টি থেকেই সৃষ্টি জেগে ওঠে, প্রাণ থেকেই প্রাণ, এ তাঁর ভালোই জানা ছিল। আর, সৃষ্টির ক্ষুধায় সে প্রাণ সব-কিছুর থেকেই রস নেয়। অজস্র রসের প্রেরণা যেমন বর্তমানে এবং প্রকৃতিতে, তেমনি তা অতীতের সঞ্চিত সম্পদে আর ভবিষ্যতের ধ্যানগম্য আদর্শে, সাহিত্যে সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে; যেমন চারুকলায় তেমনি বিচিত্র কারুকর্মে; যেমন মানুষের দূরপ্রসারিত ইতিহাসে তেমনি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। স্বভাবসিদ্ধ হলেও, পরিবেশের বিশেষ মাহাত্ম্যে শান্তিনিকেতনে এসে এই বোধ জাগ্রত, জীবন্ত, স্পষ্ট হল নন্দলালের শিল্পীজীবনে। রবীন্দ্রনাথ কী অনুকূল ক্ষেত্র, কী রসের আবহাওয়া স্বতই সৃষ্টি করে তুলছিলেন এখানে! সচেতন চেষ্টাও তাঁর কতখানিই-না ছিল! নিজের রচিত গান কবিতা গল্প প্রবন্ধ -পাঠ তো ছিলই, তা ছাড়া শেলি কীট্‌স্‌ ব্রাউনিং কালিদাস এঁদের রচনা নিয়েও অধ্যাপনা করেছেন তিনি মাঝে মাঝে। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় মূল মহাভারতের কণ্ঠস্থ শ্লোকাবলী আবৃত্তি করে গেছেন সুর ক'রে আর তার ব্যাখ্যা ও আখ্যান-অনুস্মৃতি করেছেন অভিনব কথকতার ভঙ্গীতে। মন্দিরে উপাসনা, উৎসব, অভিনয়, নিত্য

বা নৈমিত্তিক বৈতালিক, জ্ঞানী ও গুণী -জনের নিয়মিত যাওয়া-আসা, বহু-জনের সম্মিলিত জীবনের হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশা, পারিপার্শ্বিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ও সহজ লেন-দেন —এ সবও আছেই। আশ্চর্য নয়— নন্দলালের জীবনের বিশেষ ঐশ্বর্যপূর্ণ অধ্যায় এখানে শুরু হয়েছে। প্রতিভার আত্মআবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সৃষ্টিধারায় ও শিষ্য-প্রশিষ্য-ধারায়— চিত্র, মূর্তি, কারিগরি, উৎসবসজ্জা, নাট্যপ্রসাধন ও তাবৎ বিষয়ে স্থায়ী রুচি, সব দিক দিয়েই জাতি ও যুগ বিশেষ লাভবান হয়েছে, ধন্য হয়েছে।

এই আশ্রম থেকেই কবিগুরুর সাহচর্যে গিয়েছেন তিনি ১৯২৪ সালে চীনে, জাপানে, দ্বীপময় ভারতভূমিতে এবং বর্মায়; পরবর্তী অন্য এক উপলক্ষে সিংহল দ্বীপে। মহাত্মার আহ্বানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেই গিয়েছেন তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সাজাতে; ফৈজপুর কংগ্রেসে সামান্য বাঁশ ও 'বল্লী' দিয়ে অসামান্য মঞ্চ ও তোরণরাজি নির্মাণ করতে, কংগ্রেসের প্রথম পল্লীঅধিবেশনের সকল রূপসৌষ্ঠবের ব্যবস্থা করতে— আজও কানে বাজছে বাপুর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি। বিস্ময় জাগাচ্ছে তাঁর অলৌকিক লোকচিত্ত ও লোকচরিত্র -জ্ঞান। কেননা, নন্দলাল যখন বলেন 'আমি তো বাস্তুকর্ম জানি নে', তিনি বলেছিলেন— 'নন্দলাল, তুমি যদি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো তা হলে স্থাপত্যবিদ্যাও তোমার স্বতই জানা হয়েছে।' অবশেষে এই শান্তিনিকেতন থেকেই গেছেন নন্দলাল হরিপুরা কংগ্রেসপুরী সজ্জিত করতে— নূতন কালের উপযোগী শত শত নূতন পট দিয়ে বিচিত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন— ইঙ্গিত করেছেন অতীত প্রথা আর যুগের প্রয়োজন, লোকচিত্ত আর শিল্পীর খুশি, দিন-মজুরি আর চিরন্তনের বেগার, উভয়ের চেনাপরিচয় ও কোলাকুলি কোন্ রাস্তায়, কোন্ দিকে। শেষোক্ত প্রসঙ্গে মনে পড়ে গুরু একবার গুরুদক্ষিণা চেয়ে বসলেন প্রিয় শিষ্যের কাছে— 'আমাদের আর্ট্ বিশেষ গোষ্ঠীর জিনিষ, গণ্ডীর জিনিষ— পট আঁকো যাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই হবে আনন্দ।' কত কথাই তো বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ কত রকম মেজাজে, নন্দলাল কখনো হাল্কাভাবে নেন নি। এ ক্ষেত্রেও বসে গিয়েছেন

*

চাষী ও মজুরের আনাগোনার রাস্তার ধারে, না জানি কোন্ রাইরাজা-তলার হাটে। রঙ তুলি দিয়ে দ্রুত রীতিতে এঁকেছেন নবোদ্ভাবিত পট এবং যার ভালো লেগেছে দু-এক আনা দামে তাকে বিক্রিও করেছেন। যে পটগুলি উদ্বৃত্ত রইল একদা এনেছেন গুরুকে দেখাতে, গুরু তৎক্ষণাৎ গুরুপ্রণামী হিসাবে বাজেয়াপ্ত করেছেন সবই— জনজীবনের অংশভাক্ হবার দায়ে আর সেগুলি ফেরি করতে দেন নি।

উপস্থিত কালে, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে যখন নন্দলাল স্থায়ী হয়েছেন ও সৃষ্টি করছেন, সেই কালে ফিরে আসা যাক। কৃতী হয়েছেন, সংস্কৃতিবান্ সমাজে আজ পরিচিত হয়েছেন, এমন সকল ছাত্রই এই কালে এসেছেন নন্দলালের কাছে, কেউ আগে কেউ পরে। এ কাল আমাদের চোখে দেখা এবং আজও যেন চোখের সামনেই ভাসছে, অথচ হঠাৎ হুঁশ হয়, জানতে পারি— 'নেই'— কত দূরেই-না চলে গেছে। যাক, এজন্য খেদ করে লাভ নেই। শিল্পীজীবনের এই প্রৌঢ় পূর্ণপরিণত অধ্যায়ে বিশেষ কী ঘটেছে, তার তাৎপর্যই বা কী, সেইটে এ স্থলে আলোচনা করাই দরকার এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-বশতঃ হয়তো সম্ভবও।—

১। এই সময়ে ওয়াশ বা ভিজে কাগজে-কাপড়ে রঙ ধরিয়ে এবং রঙের ধোওয়াট ধরিয়ে যে আঁকার পদ্ধতি, তা ত্যাগ ক'রে পরম্পরাগত লিপ্ত পদ্ধতির দিকে ক্রমিক ঝোঁক পড়ায়, নন্দলালি শিল্পপ্রতিভার অনন্যতা বিশেষ করে ফুটে উঠেছে, দৃঢ় হয়েছে। পরম্পরাগত শিল্পাদর্শ, ধ্যান ও মনন, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি নন্দলালের চিত্রকর্মে এগুলি সহজেই প্রকাশমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। অথচ, চীনা, জাপানী, বিলাতি— মিশরীয়, পারসিক, গ্রীক— প্রাগৈতিহাসিক, বর্বর, সুসভ্য— অনুকারী, অনুবাদকারী, অবাস্তব— সব রকম আর্টেরই তত্ত্বসন্ধান, প্রয়োজনমত অনুশীলন, সম্ভবমত আত্মী-করণ, তাও চলেছে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে। বিবিধ করণ উপকরণ ও আশ্রয় নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা, তারও যেন শেষ নেই। অর্থাৎ, জাগ্রত

মন ও জাগ্রত প্রতিভা যেমন নিজেকে দিচ্ছে, তেমনি নিজের ক'রে নিচ্ছে যেখানে যা পাওয়া যায়— তাতে শরীরসংস্থানবিদ্যাও বাদ পড়ে নি আর চীনা তূলির বিশ-পঁচিশ রকমের টান-টোন ছাপ-ছোপের কায়দাকানুন সার্থকতা তাও পরিশীলিত ও পরিচিত হয়েছে।

৩। হ্যাভেল, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আরও অনেকেই চেয়েছিলেন চারুকলার সঙ্গে সঙ্গে কারুকলার উজ্জীবন। চেষ্টা চলেছিল ক্ষীণপ্রাণ মন্দগতিতে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের যৌথ জীবনের প্রয়োজনে, নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির আয়োজনে এবং রবীন্দ্রকাঙ্ক্ষিত গণসংযোগের চেষ্টার ফলে, আজ তা প্রাণপূর্ণ বেগে, বিচিত্র ক্ষেত্রে, বিবিধ উপায়ে উপকরণে প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। এই-সকল ব্যাপারে নন্দলালের প্রতিভা নিযুক্ত থাকাতে, মনে হতে পারে, অযথা তার কালব্যয় হয়েছে, শক্তির অপচয় ঘটেছে। আসলে তা নয়— প্রয়োগবৈচিত্র্যহেতু তার স্ফূর্তি হয়েছে, বহু ক্ষেত্র থেকেই তা রাজখাজনা আদায় করে নিয়েছে, অজস্র খুঁটিনাটির ভিতর দিয়েও আপনাকে চিনে নিয়েছে। কেবল ছবি এঁকে বা মূর্তি নির্মাণ ক'রে কী ফল হবে, কে বুঝবে, কে তা নেবে, কোথায় বা রাখবে! সব দিক দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে, শিল্পের দৈন্যদুর্বলতাও ঘোচবার নয় আর সমুচিত সমাদর এবং উপযোগিতাও তার থাকতে পারে না।

৪। অবশ্য, সমাজে ও সভ্যতায় যে সঙ্কট বা সমস্যাজটিলতা আজ অতিপ্রকট, কোনো একজন দুজন বা দশজন শিল্পীর তা বশীকৃত হবার নয়; যুগচিত্তের যে অস্বাভাবিকতা, উন্মার্গগামিতা, তার স্বাস্থ্যবিধান অতি দুরূহ! তবু তো সাগ্নিকের যজ্ঞাগ্নির মতো শিল্পকে শিল্পাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আশা ও বিশ্বাস হারালে চলবে না। সে দিক দিয়ে শিষ্যপ্রশিষ্যধারায় নন্দলালের যে প্রভাব ধীরে ধীরে, দিকে দিকে, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বা পড়ছে, তা থেকে কল্যাণই হবে, ভারতীয় শিল্পশ্রী উজ্জ্বল হবে। পরম্পরাগত শিল্প সম্পর্কে বিদ্রোহ যদি জেগে থাকে, যথাকালে সেও কি আপন নির্দিষ্ট বৃত্তপথ

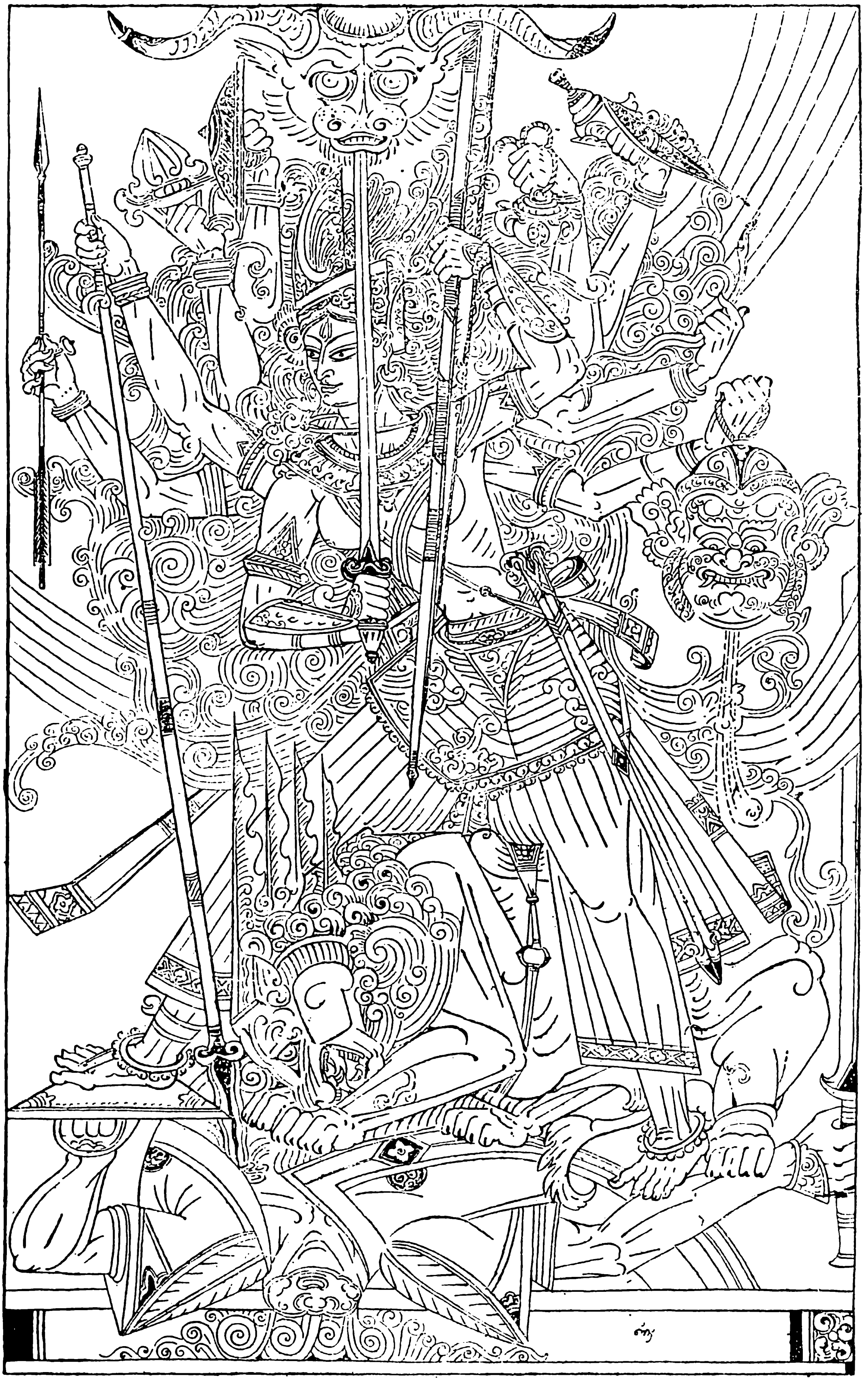

শ্রীদুর্গা ॥ ১৯৩২

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
এপ্রিল ১৯২৩

শেষ করে শমে ফিরে আসবে না? কলাভবনে এসেছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র শুধু নয়, ছাত্রীও। এই সম্পর্কে আচার্যের একটি মন্তব্যের উল্লেখ না করে থাকা যায় না। পরমহংসদেব বলেছেন ওঁদের— 'আনন্দময়ী'। কবি বা শিল্পী যে বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? তা ছাড়া, জীবধারিণী জীবপালিনী মেয়েরা উত্তরজীবনে শিল্পের অখণ্ড সাধনা না'ও যদি করে উঠতে পারেন, শিল্পের প্রভাব, শিল্পের পরিবেশ, তার আহ্বান ও অনুরাগ জাগিয়ে তুলবেন ঘরে ঘরে— সমাজের কোথায় বা নয়? অবস্থাবিশেষে জড়োপাসক সমাজের সঙ্গে শিল্পীর যে সংগ্রাম নিঃশব্দ ও নিরবধি, তাতে ওঁরাই তো দক্ষ 'পঞ্চম-বাহিনী'— আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে অতিশয় নিঃশব্দ। আর, চতুর ব'লেই শত্রুশিবিরে আদৌ কোনোরূপ জানাজানি হবার ভয় নেই।

৫। পূর্বেই বলেছি, যে মুহূর্তে নন্দলাল শান্তিনিকেতন আশ্রমে— এই শাল-তাল-খেজুর-শোভিত নতোন্নত রাঙামাটির দেশে পা দিলেন, অমনি এখানকার প্রকৃতি তাঁকে আপন করে নিল। প্রকৃতির স্পর্শ পূর্বেও পেয়েছেন, না হলে কোনোরকম প্রাণস্ফূর্ত রূপকলাই সম্ভব হত না— কিন্তু সে যেন ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবেও নয়। চেতনা অন্তরে থাকলেও বিশেষভাবে অনুশীলন ও আরাধনা করা হয় নি রহস্যময়ীর; অন্তরের গোপনে তিনি কাজ করে গেছেন মায়া বুলিয়ে, বাইরে তেমন ধরা দেন নি। শিল্পী এখন নীড় বাঁধলেন অবারিত বিশাল প্রকৃতির পরিবেশে, আবর্তিত ঋতুনাট্যের কেন্দ্রস্থলে, নটরাজ কালের পাদপীঠতলে— দ্বিতীয়বার জন্ম হল যেন চিরপ্রথম ও পুরাতন জননীর ক্রোড়ে। জন্মের তো শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ক'রেই প্রকৃতির কবি সে তো জানা আছে। তাঁর গানে গল্পে কবিতায় অভিনয়ে সেই প্রকৃতিকেই তিনি অন্তঃপ্রকৃতির রঞ্জনে ও রসায়নে, নিবিড় ও তদ্গত মানবউপলব্ধির বিষয় করেছেন— শিল্পীর জীবনে তারও তো ছোঁয়াচ লাগল। চিরন্তনকে নূতন করে চিনে নেবার জিজ্ঞাসা জাগল। ফলতঃ, আচার্যের মুখে শুনেছি, এখানে থাকতে থাকতে মনে হল দশ দিক যেন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করছে— 'তুমি তো শিবেরই ছবি আঁকো?' শিল্পীকে

অপ্রস্তুত করা গেল না। আশ্রমে পদার্পণমাত্রেই এখানকার আলো-বাতাসের স্পর্শদীক্ষা পেয়েছেন তিনি, দৃষ্টি ধুয়ে গেছে, তিনি বললেন—'হাঁ, তাই এঁকেছি। এখন শালগাছ তালগাছ যদি আঁকি, তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব।' অবিশ্বাসী যুগকে বলতে ভয় হয়, এ কথার তাৎপর্য অতিশয় গভীর ও দূরগামী। প্রথমতঃ, এতদিন শিব যে এঁকেছেন শিল্পী, লোকের মুখের কথা শুনে, কাব্য পুরাণ প'ড়ে, বা ধার-করা বিশ্বাসের উপর নয়। দৃশ্যতঃ যেমনই মনে হোক, সত্যই যদি তাই হ'ত, তা হলে শালগাছ তালগাছ সামনে এসে দাঁড়াতেই হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ শিবকে মন্দিরে বা মনোমন্দিরে, বড়ো জোর গুরুর মধ্যে, মহতের মধ্যে, মানুষের মধ্যে দেখাই এক কালে পর্যাপ্ত ছিল— আজ তা নয়। গাছের মধ্যেও দেখতে হবে। ফলে নন্দলালের তূলি নূতন বিষয় পেল, আজ থেকে নবতন রূপেই তাকে প্রকাশ করবার সাধনায় মজে গেল। তাঁর চিত্রপটে গাছের মধ্যেও দেবতাকে প্রত্যক্ষ করি নি কখনো, ক্ষুদ্র কার্ডে পেন্সিল বা কালী দিয়ে আঁকা ধোপার গাধাতেও ধ্যান মূর্তিমান্ হয় নি কোনোদিন —এ কথা বলতে পারব না। পূর্বেও যেমন সাঁওতালি নাচের লিথোচিত্রে, আমাদের অধিকাংশের চোখে দেখা সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের অনেক বেশিটাই দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

ফলতঃ, শান্তিনিকেতনে এসে অবিরাম অনুশীলনের দ্বারা যেমন যুগ-যুগান্তরের দেশ-দেশান্তরের রূপকলা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল— একটার পর একটা শিক্ষার দ্বারা, পরীক্ষার দ্বারা, আঙ্গিক বা ক্রিয়াকৌশলের প্রকার বেড়ে গেল— তেমনি বিষয় বেড়ে গেল আদিঅন্তবিহীন চিরন্তনকে প্রত্যক্ষ ক'রে।

অদ্যতন ভারতীয় চিত্রকলায় প্রকৃতিচিত্র যে ক্রমশই অনেকটা আসর জুড়ে বসেছে, এইভাবেই তার সূচনা। নন্দলালের ছাত্রদের বিষয়-বাছাইয়ে এর ইতিহাস পরিস্ফুট, কৃতী ছাত্র কয়েকজন এই দিকেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন টেক্‌নিকের তেমনি বিষয়ের পরিবর্তনে, অবনীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ -হেতু নবঅভ্যুদিত চিত্র-

কলায় যে একটা বদ্ধজলের বা রুদ্ধকক্ষের ভাব এসে যাচ্ছিল, তার থেকে মুক্তি পাওয়া গেল এক উদার বহতা স্রোতে— এক সজন লোকালয়ে— এক বৃহৎ পৃথিবীতে। নন্দলালি প্রতিভার ক্রমবিকাশে, তাঁর আপন রূপকৃতিতে তো বটেই, তাঁর শিষ্যপরম্পরার সাধনাতেও মনে হয়, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ -প্রবর্তিত নবচিত্রকলা অকালমৃত্যু বা মূর্ছা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

এখন থেকে শুধু ছবিতে নয়, অজস্র স্কেচের ভিতর দিয়ে নব্যচিত্রকলার এক নূতন ধারা প্রবাহিত হয়ে চলল। আমাদের দেশে এ একটা আশ্চর্য অপূর্ব ব্যাপার। আর এ জিনিষ অন্য দেশের ক্ষীণপ্রাণ অনুকরণ হয়েই থাকবে না, খবর বলার বা নোট রাখার স্তরেই পড়ে রইবে না— শিল্প-সঙ্গীতিতে সহজ সুরের, দ্রুত তালের, বিচিত্র ভঙ্গীর সর্বজনহৃদয়স্পর্শী এক জলসা জমিয়ে তুলবে— এজন্য নন্দলালের মতোই বড়ো শিল্পীর আশ্চর্য প্রতিভার অপেক্ষা ছিল। আচার্য বলেন, মিথ্যা অহমিকা তাঁর নেই— 'আমি মুকুল দে'র স্কেচ করা দেখে প্রথম প্রেরণা পাই। সেকালে তার স্কেচের নকলও করেছি।' কিন্তু আজ তাঁর স্কেচ, তার মধ্যে কার্ড্-স্কেচও অসংখ্য, বিষয়ের দিক দিয়ে নয় শুধু, আঙ্গিকের দিক দিয়ে আর মেজাজের দিক দিয়েও এত বিচিত্র নিপুণ আর স্বতঃস্ফূর্ত যে, অন্যের অনুকরণের বাইরে এবং স্বতন্ত্র এক আলোচনার বিষয়। শুনেছি তাঁর নিজেরই কাছে কার্ড্-স্কেচ প্রায় দেড়-হাজার দু-হাজার আছে, ছাত্রছাত্রী আত্মীয়বন্ধুদের যা বিতরণ করেছেন ঐ সংখ্যার চতুর্গুণ তো বটেই।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আচার্য নন্দলালের কথা অল্পই বলেছি। মানুষ নন্দলালের বিষয় উত্থাপন করা হয় নি। শিল্পী নন্দলালের পরিচয় রয়েছে সর্বজনসমক্ষে, সকল কালের জন্য। এ দেশে অল্প যাঁরা শিল্পরসিক ও অনুসন্ধিৎসু তাঁরা জানেন— তাঁর আঁকা সাঁওতাল যুগলের পূর্ণায়তন রেখাচিত্রে প্রেরণা পেয়ে কবি লিখেছেন 'দূরে গিয়েছিলে চলি'; তাঁর

কার্ড্‌গুলির রসোজ্জ্বল ভাষ্য 'ছড়ার ছবি' কবিতার বই ; ছন্দের মালা পরিয়ে তাঁকে বার বার বরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, আশীর্ভাষণ উচ্চারণ করেছেন। বসুবিজ্ঞানমন্দিরে, বরোদারাজের কীর্তিমন্দিরে, শান্তিনিকেতনের চীনা-ভবনে ও গ্রন্থাগারে, শ্রীনিকেতন-উৎসবপ্রাঙ্গণের অনাবৃত ভিত্তিগাত্রে, শিল্পীর সাবলীল সাহসিক তূলির স্বাক্ষর যে-কেউ গিয়ে পাঠ করতে পারবেন। দেখতে পাবেন যে 'তপস্বিনী উমা'র কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, ভাগ্যবান সংগ্রাহক -কর্তৃক পরবর্তী কালে উপহৃত হয়ে আজ ঘরে ফিরে এসেছে বলা যায়— রয়েছে কলাভবনের হ্যাভেল-হলে। 'উমার ব্যথা' চোখে আঁকা রয়েছে তারই, একবারও দেখেছে যে অনিমেষ দৃষ্টিতে। কালী-তূলিতে আঁকা মহাপ্রস্থানের বৃহৎ ছবিতে অপরিচিতপূর্ব আঙ্গিকের যার-পর-নেই দুরূহতা ও দুর্জ্ঞেয়তা লুপ্ত হয়ে গিয়ে, ভিতরের ও বাহিরের আকাশের বিস্তার, আনন্ত্যের ব্যঞ্জনা, প্রশান্তি, ফুটে উঠেছে এমন, যা উঁচুদরের চীনা ছবিতে কেবল পাওয়া যাবে— আছে তবু ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, নন্দলালি প্রতিভার নিজস্ব ছাপ। পথহারা গাভী, পার্থসারথি, রাধার বিরহ, কলঙ্কভঞ্জন, নটীর পূজা', সংঘমিত্রা, তামার পাতে রুক্ষরেখাঙ্কিত গাণ্ডীবী, কাঠে বা লিনোলিয়ামে কাটা গ্রীষ্মদুপুর বা জ্যোৎস্নারাত, পুরী ও গোপালপুরের সমুদ্র, মানস চিত্রশালার দরোজার একটি পাল্লা একটু ঠেলে দিতেই এক ঝলকে সবই যেন দেখা যায়— এগুলি এবং অপরিসীম রূপৈশ্বর্য আরও যা আছে স্মরণে কিছুরই তো ক্ষয় নেই।

শিল্পীর অত্যল্প এই পরিচয়কথা। সব যুগের সব দেশের শিল্পীমহলে কত উচ্চে তাঁর স্থান, সংশয়ের অতীত ক'রে মহাকালই একদিন তা নির্দেশ করে দেবেন।

আচার্য তিনি প্রাচীন পরম্পরা -অনুযায়ী। অর্থাৎ, শিল্পে শিক্ষা শুধু দেন নি শিষ্যদের, দীক্ষা দিয়েছেন। একাধারে বাপের মতো, ভাইয়ের মতো, বন্ধুর মতো দিয়েছেন স্নেহ প্রেম আহ্লাদ। যে নিয়েছে, নিতে পেরেছে, সেই ধন্য হয়েছে। গুরু-শিষ্যের প্রীতিমধুর গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থেকেই শিল্পসাধনার সূচনা, শ্রীবৃদ্ধি, তার সত্যের প্রতিষ্ঠা— শিষ্যভাবে এবং আচার্যভাবে এই তাঁর অভিজ্ঞতা, এই তাঁর দৃঢ় প্রতীতি।

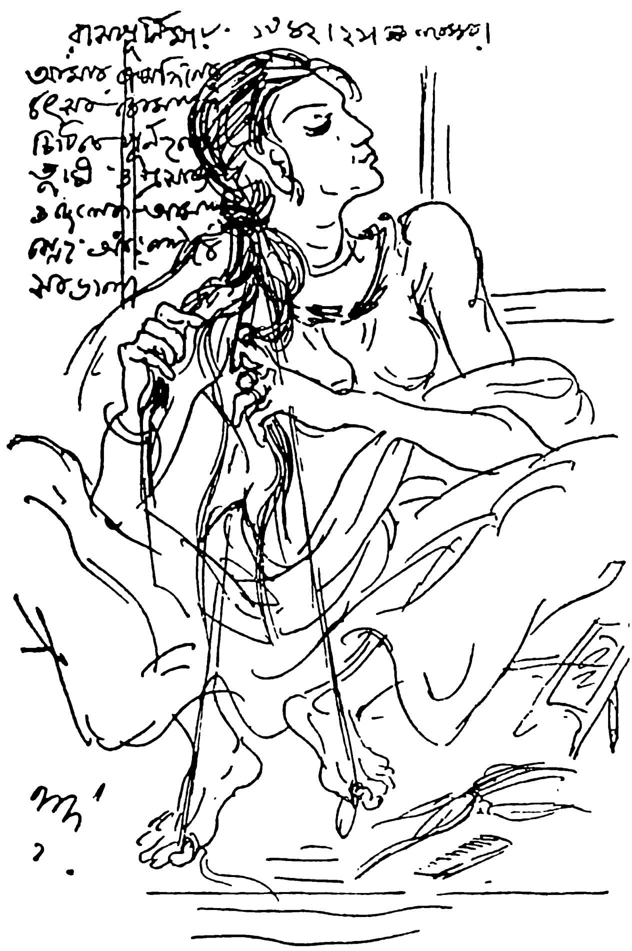

সর্বত্রই স্কুল হয়ে হয়ে গুরুকুল তথা গুরুশিষ্যসম্পর্ক একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে না, অনাবশ্যক ও অবান্তর মনে হবে না —এ আশা, এই প্রত্যাশা আমাদেরও অন্তরে অন্তরে পোষিত থাক্।

মানুষ নন্দলাল শ্রদ্ধা দিয়ে গঠিত। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ। আর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজি এঁদের সকলকেই বুঝতে চেয়েছেন— প্রণাম ক'রে অন্তরে গ্রহণ করেছেন —কোনোরূপ দলগত সঙ্কীর্ণতা বা অন্ধভক্তির ফেরে পড়েন নি।

নন্দলাল প্রীতি দিয়ে গঠিত। যৌবনকে ভালোবেসেছেন, জীবনকে আদর করেছেন, শিশু আর গ্রামবাসী উভয়ের সঙ্গেই সরল হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আত্মপ্রত্যয় সত্ত্বেও আত্মাভিমান লালন করেন নি।

আপনার সাধনায় আপনাকে ভুলেছেন। শিল্পের সাধনা তাঁর জীবনেরও সাধনা হয়ে উঠেছে।

রূপস্রষ্টা শ্রীনন্দলাল বসুর জীবনের সপ্ততিতম বর্ষের সূচনায় একদিন আমরা তাঁকে প্রীতি ও প্রণাম নিবেদন করেছি, আজ আবার প্রণাম করি তাঁকে অশীতিতম বর্ষের দ্বারদেশে। সুস্থদেহে শতায়ু হোন তিনি। সততই হোক তাঁর তূলি—

'শিবজটাসম
চিররসনিষ্যন্দী!'

জোড়াসাঁকো
অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
পুনর্লিখন : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

[১] কলাভবনের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা — 'নন্দন'।

[২] অন্তত 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পড়লে তাই মনে হয়। পক্ষান্তরে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ১৫৬) হেঁয়ালির সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাস করেছিলেন বা পাশ কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে।

[৩] ক্রমে ক্রমে বেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন্দ্রনাথ দে, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি এসে জুটেছেন। কে কবে এসেছেন বিনা অনুসন্ধানে বলা যাবে না।

[৪] রসবোধ ও রূপপ্রীতির এক ক্ষেত্র থেকে আরএক ক্ষেত্রে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়েছিল ব'লে দোষ হয়েছিল কিছু ? বারুদ সঞ্চিত ছিল সেখানেও যেমন, এখানেও তেমনি ; উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গকে উপলক্ষ ক'রে নিমেষেই নানা আকারের নানা ঢঙের তুবড়ি হাউই আশমান্‌তারা নানা রঙে আগুনের ফুল কাটল, ফোয়ারা ছোটালো —এইটেই চরম খুশির কথা নয় কি ? শিল্প যেখানে খাঁটি হয়, রসোত্তীর্ণ হয়, কবিতা থেকেও ছবি হয় নি আর ছবি থেকেও কবিতা হয় নি— দু'ই হয়ে উঠেছে মানুষের হৃদয় থেকে, চেতনা থেকে, রূপ ও রসের সংহত সংযত আনন্দ থেকে। বাইরে-কুড়োনো তথ্য যাই বলুক। আরও এগিয়ে বলা যায়— বিশ্বপ্রকৃতি থেকে যা নেওয়া হয়, যাকেই 'বিশুদ্ধ শিল্প' কেউ কেউ বলেন, তাও মানবপ্রকৃতিরই দান বিশ্বপ্রকৃতির হাত-ফেরত হয়ে এসে পৌঁছল। স্রষ্টার তথা রসিকের গভীর প্রকৃতি যা-কিছু স্বীকার করে নিল, স্বকীয় করে নিল, সে যে সকল প্রকার ঋণ -মুক্ত হল— দলিল-দস্তবেজ-ধারী যাই বলুন। স্থুল বিচারেও 'বিজাতি-স্পর্শ-বিমুখ' বিশুদ্ধতার কোনো অর্থ হয় কি ? বিজ্ঞান, ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প, কারু-কর্ম, আচার, অনুষ্ঠান, সবগুলি কি একই মানবজীবনের বিভিন্ন অঙ্গ নয় ? একই প্রাণে একই উদ্দেশ্যে সঞ্জীবিত ও সক্রিয় নয় ? প্রত্যেকটির একক প্রকর্ষের সাময়িক (সঙ্গিনও বটে) একটা প্রয়োজন থাকলেও, সবগুলির অন্যোন্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, একতান বিকাশে ও উন্নতিতেই তাদের ঐশ্বর্যের সীমা— সার্থকতারও।

[৫] এ ঘটনা সম্ভবতঃ নন্দলাল ও নিবেদিতার প্রথম-সাক্ষাৎকার-কালীন নয়।

[৬] আচার্য নন্দলালের জীবনকথা : নিরীক্ষা : নন্দলাল-সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫১)

[৭] এই বিষয়ে একাধিক ছবি আছে। যে ছবির প্রতিলিপি রয়েছে শান্তি-নিকেতন গ্রন্থাগারের এক তলায়, ভিত্তিগাত্রে, উপস্থিত সেইটির কথাই বলছি। রেখাছন্দ প্রাচ্যচিত্রের প্রাণ। রেখাই নন্দলালেরও চিত্রপ্রতিভার ধারক বাহক এবং ক্রিয়াকৌশলগত উৎকর্ষের সীমাস্বরূপ। উল্লিখিত ছবিখানি আঁকতে বসে হঠাৎ অনুভব করলেন নন্দলাল— জীবন্ত রেখা তুলির অনুসরণ করছে না, তুলির আগে আগে চলেছে। অপূর্ব এক আবেশ ও আনন্দ। রূপকরী তন্ময়তার অবিরল মুহূর্তে, এ উপলব্ধি আর কখনো নন্দলালকে ত্যাগ করে নি।

লক্ষগোচর রূপের অন্তরে অপূর্ব রসরূপের আবিষ্কারে কবি ও শিল্পী এক দিব্য আবেশে আত্মহারা হয়ে এক অলৌকিক আনন্দময় ছন্দোময় লোকে উত্তীর্ণ হন। কবি কীট্‌স্ তাই অখ্যাত এক কলাকৃতির উদ্দেশে বলতে পারেন—

> Thou, silent form ! dost tease us out of thought
> as doth eternity !

যে সূর্য প্রতিদিন ওঠে একদিন তারই অরুণরশ্মিপাতে তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের 'স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল' তা নিমেষে দূর হয়ে 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন' মনে হয়, 'আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত'— রবীন্দ্র-প্রতিভানির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়।

এঁদের দুজনের থেকেই প্রাচীনতর কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা হয়—

> to express what then I saw, and add the gleam,
> the light that never was on sea or land

তারও কারণ এই যে, বালক-বয়স থেকেই

> a presence that disturbs ··· ···
> ··· ··· a sense sublime
> of something far more deeply interfused ···
> a motion and a spirit that impels
> all thinking things, all objects of all thought,
> and rolls through all things

অন্তরের অন্তরে তিনি অপরোক্ষ অনুভবে লাভ করেছিলেন; অপরূপা প্রকৃতিকে কেবল ইন্দ্রিয় দিয়েই দেখেন নি, স্পর্শ করেন নি। শুধু মন দিয়েই পর্যালোচনা করেন নি।

আর তেমনি যখন দেখি— কামারপুকুর পল্লীর মাঠে দিগন্তজোড়া কাল-

১

শ্রীনন্দলাল বসু

বৈশাখী মেঘের কাজল-পটে অকস্মাৎ চকিত বলাকাপংক্তির দ্রুত প্রয়াণে বালক গদাধরের কোঁচড়ের মুড়ি ছড়িয়ে পড়ে, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তখন রূপের জগতেই অপ্রত্যক্ষ যে দিব্যরূপিণীর বাস, তিনিই বালকের কানে কানে ব'লে দেন জানি : আজ থেকে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ হলে !

রূপরাগের কবি নন্দলালের জীবনে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল সে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি, বলেছি শান্তিনিকেতনে এসে কেমনভাবে একদিন তিনি রূপের জগতে দাঁড়িয়েই অমৃত বায়ু ও অরূপ আলোকের স্পর্শআশিস্ পেলেন— সেই আলো বাতাস ক্ষণতরে তাঁর সর্বসত্তায় প্রবাহিত হয়ে গেল — তাঁর জীবদেহের সকল জড়বাধাকে তখনকার মতো সম্পূর্ণ অপসারিত ক'রে দিল— এই দিব্য উপলব্ধির রেশ বেজে চলল তাঁর অবশিষ্ট শিল্পীজীবনে আর স্থায়ী ছাপ রেখে গেল চরিত্রে।

অথচ আমরা জানি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জীবনেও এমন দিব্যমুহূর্তগুলি অবিরল নয়। গদাধর যদি কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ না হতেন, বাল্যাবধি তিনি যদি মূর্তিই গড়তেন, ছবি আঁকতেন, তাঁর জীবনেও নিত্য নবীভূত রূপে ফিরে ফিরে আসত না। কবি বা শিল্পীর যে সৃষ্টি সত্যই অপরূপ হয়ে উঠেছে, রসরূপ হয়েছে, তার পিছনে কোন্ পরমাশ্চর্য ঘটনা লুক্কায়িত আছে, সৃজন-তৎপর জাগ্রত মানসের নেপথ্যলোকে কী অজ্ঞাত অভূতপূর্ব আয়োজন— কী গূঢ় আনন্দ ও চেতনা— কোন্ অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির বিশেষ ক্রিয়া— তারই ইঙ্গিত আমরা পাই এরূপ এক-একটা ঘটনায়। রঙ-তুলি আনন্দ-বেদনা ভাব-ভাষা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে তন্ময় হয়ে কাজ করে চলেছেন কোনো শিল্পী, চকিতে দেখা গেল আরএকজন নিত্যসিদ্ধ শিল্পীও গোপনে সৃজনতৎপর রয়েছেন সূক্ষ্ম মনোযবনিকার ওপারে— তাঁর কোনো নাম নেই, পরিচয় কেউ জানে না। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্ট রূপ বা প্রতিমা তাই এত সুন্দর, এমন অলৌকিক।

স্বভাবসিদ্ধ যোগী বা ভক্ত না হলেও, বালক গদাধরের সঙ্গে চমৎকার মিল রয়েছে দেখা যায় বালক নন্দলালের— উভয়েই স্বভাবশিল্পী। সমবয়সী শিশুদের সর্দার হয়ে যথেচ্ছ ক্রীড়াকৌতুকে দুজনেই মানুষ হয়েছেন পল্লী-প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে। স্থানীয় প্রতিমাকার কুমোরের গৃহ-আঙিনায়

Almora

To master Perumal

দিনের পর দিন প্রহরের পর আবিষ্ট প্রহর কেটে গেছে। প্রবীণ কারিগরের দেখাদেখি, প্রস্তুত কাদামাটি টিপেটুপে, গ'ড়ে-পিটে, আপনভোলা খেয়ালে খেলতে গিয়ে, যখনই মাটি হয়ে উঠেছে মূর্তি, বালক নন্দলালের পুলকিত মনে বিস্ময়ের সীমা থাকে নি। এই ভাবেই একাকারে আকার-সৃজনের প্রথম শিক্ষালাভ, অন্তরে থেকে অন্তর্যামীই দিয়েছেন নিগূঢ় দীক্ষা, আর তাইতেই সমস্ত জীবনের কক্ষপথ নিরূপিত হয়ে গিয়েছে।

মুক্তপ্রকৃতির পরিবেশে এই সুখের শৈশব, প্রাথমিক রূপকলাঅনুশীলনের এই বিশেষ প্রকৃতি —নন্দলালের প্রতিভা-বিচারে উভয়ই আমাদের মনে রাখতে হয়। মুখ্যতঃ রঙ তূলি নিয়ে কাজ করলেও স্বভাবতঃ তিনি মূর্তিকার। মূর্তিকৃতিতেই ভারতের পরম বা চরম বৈশিষ্ট্য। অজন্তা-বাঘ-বাদামী গুহার অজ্ঞাতনামা শিল্পী-সমাজ, তেমনি কালীঘাটের প্রাচীন পটুয়া. কিম্বা পুঁথি ও পাটার বংশানুগামী চিত্রী-গণ, এঁদের অনেকেই আসলে মূর্তিকার ছিলেন এমন মনে করার কারণ রয়েছে। তখনকার যুগধর্মে হয়তো একই ব্যক্তি হতেন মূর্তিনির্মাতা এবং চিত্রকর। সে যুগ আজ নেই। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সত্ত্বেও একই ব্যক্তির একাধিক বৃত্তি-গ্রহণের সুযোগ বা সময় নেই। নন্দলাল তাই চিত্রস্রষ্টা। অথচ চিত্ররূপ তাঁর চৈনিক অথবা পাশ্চাত্য পরম্পরাগত চিত্ররীতির থেকে অনিবার্য কারণেই বিশিষ্ট, এমন-কি গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মিল হবে না। কেননা, পূর্বেই বলেছি, স্বভাবতই নন্দলাল ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির অনুগামী আর সে রীতি ভারতীয় যুগ-যুগ-প্রচলিত মূর্তিশিল্পের যমজভগিনী।

অথচ, নন্দলাল তাঁর একলক্ষ সাধনার সরণীতে কোথাও এসে বাসা বাঁধেন নি কোনোদিন। প্রকৃষ্ট কোনো শিল্পসিদ্ধিতে পেঁ ৗছে বলতে পারেন নি 'এই তো বেশ! আর কেন!'— তাই তো গুরু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতিতে যেমন অশেষ বৈচিত্র্য, তেমনি দেখি নন্দলালের ছবিতে— মূল প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় হলেও ভাব ভঙ্গী প্রকার ও প্রকরণের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় পদে পদে। মহৎপ্রতিভার বিকাশ ব্যাপারটি আসলে অতিশয় দুর্জ্ঞেয় আর জটিল, বাধ্য হয়েই আমাদের তবু কয়েকটি সরল সূত্রে তাই নিবদ্ধ করতে হবে। আশা করি বাচনের যা-কিছু ত্রুটি ও অপূর্ণতা, তল্লক্ষ্য রূপে রূপে

মনোযোগ করলেই রসিকের তা অনতিক্রমণীয় মনে হবে না। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য-বিচারে আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম হল এইটুকু—

অবনীন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত পাশ্চাত্য চিত্ররীতি থেকে প্রাচ্যরীতির সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন, আর উত্তরকালে তারই বিপরীত মুখে নন্দলাল পা বাড়ালেন ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির সহজ অধিকারের ক্ষেত্র থেকে—ক্রমশ চীনা জাপানী বিলাতি চিত্ররীতির বিশেষ বিশেষ গুণও অঙ্গীভূত ক'রে নিয়ে বিচিত্র এবং ঐশ্বর্যশালী করে তুললেন আপন রূপসৃষ্টিকে।

রূপের বিমূর্ত ব্যঞ্জনা ও লাবণ্য থেকে যাত্রা শুরু করে গুরু চলেছেন রূপের পরিস্ফুট গোচরতার অভিমুখে, শিষ্য তেমনি মূর্তিসগোত্র রূপায়ণ ত্যাগ না ক'রেও রূপের অরূপ ভাবলাবণ্য, বিমূর্ততা আর বর্ণব্যঞ্জনা উত্তরোত্তর সেধে চললেন স্বকীয় শিল্পসাধনায়।

অবনীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ রঙ থেকে রূপে, আর নন্দলালের অভিসার বুঝিবা রূপ থেকে রঙের দিকে— যে রঙ বিশ্লিষ্ট আলোকের হাতছানি-মাত্র, আকাশ অবনীর সর্বত্র, শত দিকে।

বলা বাহুল্য যে, সূত্রনির্দেশ সহজ সরল না হলে চলে না, অথচ উভয় গুণীর মধ্যে কারও যাত্রাপথই ঋজুরেখায় এগিয়ে যায় নি, আর বিপরীতমুখী হলেও বারে বারে ফিরে ফিরে পরস্পরকে ছুঁয়ে গেছে, পরিণামে কম্বুরেখায়িত ছুটি উত্তরণসরণী জেগে উঠেছে, তার এক দিকে দেখা যায় মূর্তিসগোত্র রূপ আর অন্য দিকে দেখি পাশ্চাত্য কলাবিদ্ যাকে বলেন painterly painting— স্বভাব-স্বধর্ম-নিষ্ঠ চিত্র।

প্রতিভার প্রৌঢ় পরিণতিতে অবনীন্দ্রনাথ রূপের মায়াপুরীতে দেখিয়ে দিয়েছেন অতীত আরব্য রজনীর সাকার স্বপ্নমালা, আর নন্দলালও আমাদের নয়নগোচর করেছেন একটি দোলনচাঁপা ফুলের একটু পেলব স্পর্শ ও সৌগন্ধ, শিশিরিত-দূর্বাদল-ছোঁয়-নি ভোরের-বাতাসে-ভাসা সেই শিউলি ফুলের মতোই পোয়ে নাচের স্বপ্নাবিষ্ট ছন্দ, দ্বিজেন্দ্রসেবিত 'নিচু বাংলা'র

ধূপছায়াঙ্কিত শ্যাম-সোনা-পাটলে-রচিত অপূর্ব এক মায়া, গোয়ালপাড়া যেতে ধূলিধূসর পথে মূর্ছার মতো মনোহারিণী প্রথম ফাল্গুনের রৌদ্র-বিভাসিত একটি অপরাহ্ণবেলা, গোধূলিআলোকে প্রণয়পত্রপাঠে নিবিষ্টা একালের কোনো তরুণী, উটজদ্বারপথে দিনান্তের প্রদীপ -ধারিণী, ধূ-ধূ-ডাঙায় বৈঁচি-কুল-পিয়ালের জঙ্গলে লোলগাত্রী অসিতাঙ্গী অশীতিপরা শবরী —এই শেষ ছবিগুলি দেখা না-দেখায় মেশা অপূর্ব রূপের ব্যঞ্জনায় সুখজনক কী যেন একটি চিরঅতৃপ্তি রেখে দিয়ে যায় চমৎকৃত অন্তরে। এ ছাড়াও আছে কালো কালীতে কিম্বা বিচিত্র বর্ণের সাবলীল তূলির ছাপে-ছোপে আঁকা— সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, আলোক, মেঘ।

তাই মনে হয়— একদা রূপ এবং রেখার অব্যর্থ ব্যঞ্জনা ছিল যে নন্দলালের চিত্ররূপে, বর্ণের যথোচিত বিন্যাস ও সামঞ্জস্য, প্রতিভার বিশেষ পরিণতির ফলে অবশেষে রসতায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁর রঙ; বিশেষ ভাবেই 'ধ্বনিত' হয়ে উঠেছে; থেকে থেকে হারিয়ে গিয়েছে রূপের রেখাবদ্ধভাব। (স্বভাবেও রূপের গোচরতা নয় রেখাশ্রিত।) রূপসৃষ্টির নূতন এই রীতিতে চিত্র হয়ে উঠেছে সংগীত। বর্ণসংগীতের তানালাপে অবনীন্দ্রনাথের ছিল যেন জন্মগত অধিকার, তিনি ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ।

মূর্তিপ্রতিম রূপরচনা আর স্বনিষ্ঠ চিত্র উভয়ের মধ্যে রয়েছে 'পট'— দুই আয়তনের ক্ষেত্রে দুই আয়তনেরই ছবি। পটভূমির কিম্বা রূপের রেখাবদ্ধ বর্ণানুলিপ্ত সমতলতায় নতোন্নতভাবের দ্যোতনা নেই। এই পটেরই বিস্ময়কর উৎকর্ষ দেখা যায় কাংড়ায় অথবা রাজস্থানে; তবু তা এ দেশের বা বিদেশের ধ্রুবচিত্ররীতির সগোত্র হয় নি। শিল্পী নন্দলালও বহুবার বহুবিধ পট এঁকেছেন। ইতিপূর্বে আলোচিত মূর্তিপ্রতিম রূপকল্পনা আর painterly painting উভয় থেকেই পৃথক্ সেই চিত্রগুলির যথোচিত ধারণা করতে হলে, 'পট' সম্বন্ধে আমাদের ভাবনাকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করা দরকার। 'পট'কে বলা চলে 'চিত্রাভাস', কেননা মূর্তিতে ও পুতুলে যে তফাত (বিলাতি ডল বা নকল-মূর্তি আমাদের আলোচ্য নয়) চিত্রে এবং পটে সেই পার্থক্যই দেখা যায় না কি? প্রধানতঃ আলংকারিক ছন্দে নূতন বা পুরাতন মনগড়া

গড়ন ও মুদ্রা (motif) সাজিয়ে নিয়ে একটি কল্পরূপ প্রকটিত করাই পটের বিশেষ উদ্দেশ্য এবং সীমা, পটের বিশেষ চারিত্র। রূপ রেখা রঙের সমাবেশে নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রের মণ্ডন বা শোভাসম্পাদন ক'রেই তা সার্থক। অভ্যাস-গত পুনরাবৃত্তি মাত্র না যদি হয়, রূপ দিয়ে রসধ্বনি না জাগালেও 'শব্দধ্বনি' বা 'অলংকারধ্বনি' অবশ্যই জাগাতে পারবে।

চিত্র এবং চিত্রাভাস, পট, তুলনায় আলোচনা করে দেখি— চিত্রের আছে যেমন কায়া তেমনি অপরূপ একটি মায়া। কায়ার উপাদানভূত রেখা, রঙ, রূপ প্রতিরূপ কিম্বা রূপাভাস, আর মায়ার রচনা— ভাব চরিত্র অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনা -যোগে। কায়ার আশ্রয়স্বরূপ কাগজ কাপড় ভিত্তিতল বা পাটা, আর মায়া আশ্রয় লাভ করে দেশে কালে ঘটনায় বা কাহিনীতে। সুগঠিত কায়ার আছে রূপলাবণ্য, আর যথোচিত মায়ার দ্বারা জেগে ওঠে অনির্বচনীয় রস বা অ-লৌকিক আনন্দ। অপর পক্ষে দেশ কাল ঘটনার কোনো একটি বা দুটি বা সব-ক'টি না থাকলেও সুন্দর পট হতে পারে। দেশ নেই, বিভিন্নরূপের অবকাশে আছে সুরঞ্জিত বা নীরঞ্জন কাপড় কাগজ পাটা বা ভিত্তিতল। দিন অথবা রাত্রি, সকাল অথবা সন্ধ্যা, আলো অথবা অন্ধকার, বাদল কিম্বা কুয়াশা, বিশেষ কোনো সময়ের বিশেষ একটি আবহের প্রত্যাশা থাকে না পটে। আর, ক্রিয়া বা ঘটনা নাই থাক্, সুস্থির ভঙ্গী থাকলেই হল— কোনো জানা-শোনা কাহিনীর কতকগুলি পরিচিত প্রত্যাশিত প্রতীক বা লক্ষণ থাকলেই সুভূষিত পট হয়ে উঠল— দর্শকও খুশী হলেন। চিত্ররসিক কিন্তু সব সময়েই আকাঙ্ক্ষা করেন বিশেষ দেশ, বিশেষ কাল, বিশেষ ঘটনার স্পষ্ট রূপায়ণ না হলেও, একটু আভাস অন্তত, একটু ইশারা, আর তারই ফলে জীবনসঞ্চিত বিচিত্র স্মৃতি ও অনুষঙ্গের উদ্‌বোধন— রসের উপলব্ধি।

সংক্ষেপে বলা যায়— পটের রূপকল্পনা নানা দেশ কাল ঘটনার কোনো-না-কোনো বহির্লক্ষণ অবলম্বন করলেও নির্বিশেষ চরিত্রের হয়ে থাকে, আর চিত্ররূপ বিশেষের স্বয়ংবরা হয়ে, বিশ্বের মধ্যে বিশেষভাবে তাকেই প্রকাশ ক'রে, রসের উদ্দীপন করে এবং শিল্পী বা শিল্পরসিককে সার্থকতা দান করে।

শৈলকুহেলী ॥ মে ১৯৫৫

শিবগিরি
এপ্রিল ১৯৫৯

উল্লিখিত সংজ্ঞার্থ -অনুযায়ী শিল্পী নন্দলালের পরিণত বয়সের হরিপুরা পটগুলিকে অবশ্যই পট ব'লে চেনা যায়, কিন্তু তাঁরই যুবাবয়সের আঁকা রাম-সীতা-আখ্যানের রূপরাজিকে কী নামে অভিহিত করা হবে? বন-উপবন, সিন্ধু-সরিৎ, প্রভাত-সন্ধ্যা, তারকিত নিশা, এ-সবই পটের পর পটে রূপায়িত; আর অপূর্বসুন্দরভাবে মুখরিত শ্রীরাম-জানকীর মিলন বিরহ বিচ্ছেদের করুণ মধুর কাহিনী। এগুলিও পট এজন্যই যে, এই-সব আলেখ্যে প্রতি পদে নানা দেশ কাল ঘটনার নানা ভঙ্গী যথোচিত প্রতীক -যোগে রচিত হলেও, সে রচনায় নেই বিশেষের বাস্তবতা বা রিয়েলিজ্‌ম্। সীমাবদ্ধ পটভূমির মণ্ডন বা অলংকরণই যা-কিছু আকার এবং আয়োজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অন্য ভাবে বলা চলে— পট আঁকতে হলে রূপায়ণে যেমন, দেশ কাল ঘটনার পরিমিত প্রয়োগেও তেমনি পরম্পরাগত কৌশল আর মনগড়া ভঙ্গীমাত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেবল এ দেশে বা এ কালে নয়, অন্য দেশে আর অন্য যুগেও। দেশ কাল ঘটনার এবংবিধ প্রতীকরচনাচাতুর্যে বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেছে জাপানের বহুশতাব্দের পটচিত্র-পরম্পরা— হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হয়ে য়ুরোপকেও মুগ্ধ করেছে এবং সেখানকার পূর্বপ্রচলিত চিত্ররীতিতে নূতন প্রাণ ও নূতন প্রেরণা -সঞ্চারের হেতুভূত হয়ে তার নবকলেবর -গঠনে আনুকূল্য করেছে।

পট এঁকেছেন অবনীন্দ্রভগিনী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী। শিল্পীজীবনের সূচনায় ও শেষে পট এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ।[১] নন্দলালের কলাকৃতি -অনুগামা শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ও শতাধিক পট আঁকেন নি এমন নয়। এ সবের মধ্যে পরম্পরাগত পটের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে প্রথমোক্ত পটে। শিল্পীর সহজ স্বকীয়তায়, মণ্ডনগুণে আর রূপলাবণ্যে, নন্দলালের পটই বিশিষ্ট।

পটে পরম্পরাগত রূপমুদ্রার ব্যবহার থাকলেও নূতন মুদ্রা-রচনারও বহু অবকাশ আছে, বিশেষ শিল্পী দেখাতে চান তাঁর বিশেষ রূপসংগতির বোধ ও বিশেষ বর্ণরুচি— এ-সব কারণেই সার্থক পট ধারাবাহী হলেও নূতন হয়ে থাকে। প্রাচীন প্রথার আধারে সেই চমৎকারজনক নূতনত্ব প্রচুর

পরিমাণেই রয়েছে নন্দলালের পটে। সে পট অতীতের দাগাবুলোনো নয় বা অতীতমুখীও নয়, তার লক্ষ ভবিষ্যতে। নন্দলালের পট পূর্বানুকৃতি নয়, তারও কোনো অনুকৃতি সম্ভবপর হয় নি আজও।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় রঙের মিড়ে মূর্ছনায় সংগীতের সাজাত্য পরিস্ফুট। মূর্ততার আকর্ষণে নন্দলালের চিত্রকৃতির প্রধান একটি অংশে শুধু যে ভারতীয় ধ্রুবচিত্ররীতির তথা ভাস্কর্য ও ধাতুমূর্তির প্রভাব অনুস্যূত তাই নয়, ছন্দোবেগবান নৃত্যের অথবা নাট্যেরও সজাতীয়তা দেখা যায়। মানবরূপ ও মানবাকার দেবতার রূপই এক কালে তাঁর চিত্রের মুখ্য বিষয় ছিল। দেশ-বিদেশের একাল-সেকালের নানা শিল্পরীতির নানা গুণ আহরণ ক'রে ও আত্মসাৎ ক'রে ক্রমশই এ সংস্কার তিনি অতিক্রম করেছেন। চিত্রের বিষয়বস্তু প্রকরণ এবং ব্যঞ্জনা বহু এবং বিচিত্র হয়েছে। কালীতুলিতে আঁকা পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের দীর্ঘায়ত চিত্র ভারতের একাল-সেকালের কোনো ছবির সগোত্র নয়, আবার চৈনিক রীতির সঙ্গেও হুবহু মেলে না। রূপকল্পনা এখানে দ্রঢ়িষ্ঠবিশাল, সহজ, সরল, সাবলীল। উৎকৃষ্ট চীনাছবির মতোই লেখাঙ্কনের গুণোপেত সমস্ত ছবিটি, অথচ তার খুঁটিনাটি অবয়বের পরিস্ফুটনে অপেক্ষাকৃত বাস্তবের ব্যঞ্জনা দেখা যায়। সীমাহীন প্রকৃতির দেখা না-দেখা রূপকে প্রাধান্য দেবার জন্য মনুষ্যরূপকে অপ্রধান করা হয় নি— ফলতঃ, নিসর্গ ও নর, প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দ্বৈতের একতান সমাবেশে, অদ্ভুত ভারসাম্যে, অ-পূর্ব এক রূপসংগীতি -সৃজনের গৌরব ও সার্থকতা একা নন্দলালের। ভারতীয় এবং চীনা রীতির প্রণয়বদ্ধ শুভ পরিণয় ঘটাতে শিল্পী সম্পূর্ণই সফলকাম হয়েছেন দেখি।

বরোদা কীর্তিমন্দিরে 'নটীর পূজা'র ভিত্তিচিত্র এঁকেছেন নন্দলাল এ দেশের ধারাবাহী রীতিতে। তৎপূর্বে ঐ চিত্রই এঁকেছেন শান্তিনিকেতনের চীনাভবনে, 'ফ্রেস্কো'[২] পদ্ধতিতে। কুণ্ডলীকৃত আখ্যানলিখন যেন প্রশস্ত ভিত্তিতলে ধীরে ধীরে খুলে ধরা হয়েছে। এজন্য পূর্বলেখ বা 'কার্টুন' তৈরি করা হয় নি। শিল্পী কিছুদিন ধ'রে মনের ভিতরে সমুদয় চিত্রটি ধারণা করেছেন। ইচ্ছা ছিল— কালী তুলির কাজ যেমন স্বতঃ এবং দ্রুত প্রসৃত

*

হয়ে থাকে এও হবে তেমনি— রস এবং ছন্দের প্রেরণে বা আকর্ষণে, ক্ষিপ্র তূলিকার টান-টোনে ও ছাপ-ছোপে, শতাধিক বর্গফুট -পরিমিত ক্ষেত্রকে বর্ণলাঞ্ছিত করতে তিন বেলার বেশি সময় লাগবে না। সংকল্পঅনুযায়ী কাজ হয়েছিল, অন্যের অলক্ষ্য রূপছন্দের অনুসরণে ছুটেছিল শিল্পীর একাগ্র মন এবং মনোবশীকৃত তূলি। কিন্তু, তিন বেলার বদলে তিন দিন লেগেছিল ছবি শেষ হতে এজন্যই যে, বেকার বর্ণভাণ্ডবাহিনী 'কী করি' 'কী করি' ব'লে একটু সবুজ রঙ দিয়ে বসেছিল চিত্রভূমির একটি পাড়ে। 'হাওয়ার পিছনে ধাওয়া' থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সেটিকে সামলে নিতেই নন্দলালের বেশি সময় লেগেছিল। যা হোক, পূর্বে যাকে স্বভাবনিষ্ঠ ছবি বা painterly painting বলা হয়েছে এই চিত্রধারা তারই অপূর্ব নিদর্শন। রেখা ও রঙ, রূপ ও ছন্দ, দৃশ্য এবং অদৃশ্য, মিলে মিশে আশ্চর্য এক রসের ঝলক।

এক কালে অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর শিল্পীদের সম্পর্কে এই নালিশ করা হ'ত যে, পুরাণ ইতিহাস কাব্য কাহিনী খুঁজে খুঁজে কল্পিত দেবদেবী মানবমানবীর ছবি করেন, প্রত্যক্ষের সম্মান দেন না, চিত্রণপদ্ধতিতে বা প্রকরণেও তাঁরা নাকি অজন্তা রাজস্থান ও অতীত দিল্লি-আগ্রার বিলুপ্ত রীতিপদ্ধতির আঁচল-ধরা। এত বড়ো বিশাল বিচিত্র প্রকৃতি, সুখে দুঃখে দ্বন্দ্বে সংঘাতে আন্দোলিত উন্মথিত মানবসংসার, সে তাঁদের কাছে থেকেও নেই। এ অভিযোগ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ক্ষেত্রে কবে সম্পূর্ণ সত্য ছিল জানি নে— নন্দলালের ছাত্রদশাউত্তীর্ণ শিল্পসাধনায় আর তাঁরও বহু কৃতী ছাত্রের কাজে নিত্যই অপ্রমাণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রতীর্থ শান্তিনিকেতনে এসে শিল্পসাধনার নূতন একটি দীক্ষা পেলেন নন্দলাল আপনারই ভিতর থেকে। দৃশ্যপ্রকৃতির অন্তরনিবাসিনী অন্য যে আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, তাঁরই জ্যোতির্ময় স্পর্শে ও প্রসাদে।

বৈরাগ্যের পন্থায় একাধিক দীক্ষার কথা শোনা যায়, অনুরাগের সাধনাতেই বা না থাকবে কেন? প্রথম গুরু পরমগুরুকেই দেখিয়ে দেন, পূর্বের দীক্ষাকে সার্থক সম্পূর্ণ করে নিগূঢ়সঞ্চারী আরএকটি দীক্ষা এসে। ঠিক এই রকম ক'রেই মুক্তদ্বার মানবসংসারে ও নিখিল নিসর্গলোকে

নন্দলালের প্রবেশ অব্যাহত হল। তার পরে এত বিচিত্র পথে গিয়েছে তাঁর অতন্দ্র শিল্পসাধনা, এমনই নিত্য নূতন যে, এখানে অল্প পরিসরে তার বিবরণ দেওয়া চলে না আর আমাদের শক্তিও নেই।

কেবল এইটুকু স্মর্তব্য যে, নন্দলালের ছন্দ রূপ এবং রসের সাধনা যেমন তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিত্রধারায় নিরন্তর প্রবাহিত, তেমনি নিত্য বিকাশশীল প্রস্তর অথবা ধাতু -ফলকে, কাঠে, লিনোলিয়ামে, কার্ডে, খসড়া-খাতায়। বিশেষতঃ কার্ড্‌স্কেচে। অল্পকালের অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলেই নন্দলাল এই স্কেচের কাজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করলেন যে, অভিনব এক চিত্র-রীতির উদ্ভব হল— অন্তত এ দেশে তা একেবারেই নূতন। মানবপ্রকৃতি ও নিসর্গপ্রকৃতির চলচ্চিত্রমালাকে চলতে চলতেই ছ'কে নেওয়ার মতো। প্রতীচ্যেও স্কেচ করার রীতি আছে, কিন্তু খসড়া প্রায়শই খসড়া থেকে যায়— শুধু হাত এবং হাতিয়ারের দক্ষতাই অর্জিত হয়। পূর্ণাঙ্গ চিত্র-রচনার কালে স্মৃতি উদ্‌বোধিত করে ও উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। এই স্কেচ প্রধানতঃ বিষয়টি দেখে দেখেই আঁকা, রঙে বা রেখায়।

নন্দলালের স্কেচ বা কার্ড্‌স্কেচের প্রকৃতি সাধারণতঃ আর-এক প্রকার। সেগুলি সম্ভবপর পূর্ণাঙ্গ চিত্রের আভাস বা পূর্বাভ্যাস হোক বা না হোক, নিজেরাও এক-একটি নিখুঁত ছবি। কখনো রঙ, কখনো রেখা, কখনো ছাপ-ছোপ, কখনো গড়ন, বিচিত্র উপায়-উপকরণে তাদের নির্মিতি— কাজেই বিচিত্র তাদের রূপ। যত রূপ শিল্পীর ছবিতে তত তাঁর স্কেচে, তবে আরও ক্ষণউদ্‌ভাসিত অপ্রস্তুত বেশে— এই পর্যন্তই বলা যায়। সাধকেরা বলে থাকেন— যেমন প্রতিদিনের ঘষামাজায় ধাতুপাত্র ঝক্ ঝক্ করে, তেমনি নিত্য নিয়মিত ধ্যানের অভ্যাসে চিত্ত থাকে নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল। এই স্কেচের ছলে নন্দলালের তেমনি চোখ-চাওয়া ধ্যান-ধারণা। ধ্যানের যা বৈশিষ্ট্য সেটিও এই স্কেচে বর্তমান। পাশ্চাত্য চিত্ররীতির থেকে পৃথক্। বহু স্কেচ করেন নন্দলাল স্মৃতি থেকে। ভোর রাত্রের নিষুপ্ত নির্জনতায় বাইরে যখন সুপ্তি ও অন্ধকার, একটি আলো জ্বালেন মনের গহনে, লণ্ঠন জ্বালেন একটি কোলের কাছটিতে (বিজলী বাতি সব সময় জ্বলত না আর সর্বত্র পাওয়াও যায় না) পরে একটির পর একটি কার্ড্ এঁকে চলেন— কত চকিত

মুহূর্তের কতকিছু দেখা। যেদিন যা-কিছু দেখেছেন কিছুই হারায় নি, সবই যেন স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে মনের গোপনে। সকালে সন্ধ্যায় দুপুরেও আঁকেন, কদাচিৎ বিষয় সামনে রেখে আঁকেন না তাও বলতে পারি নে— তবে, হুবহু নকল করা তাঁর পক্ষে পরধর্মই। যেটি বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য সে হল এই যে, মানসস্মৃতি স্বতই জেগে উঠে বা ধ্যানে উদ্‌ভাসিত হয়ে তাঁর অধিকাংশ ছবি হয়েছে, তাঁর কার্ড্‌স্কেচও সেই একই প্রকৃতির দ্বারা প্রেরিত— একই প্রক্রিয়ায় রচিত। কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের প্রখ্যাত উক্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত ক'রে এদের সম্পর্কে বলা চলে: seeing and feeling recollected in tranquillity। শান্তির অন্তরে সঞ্চিত, থিতিয়ে যাওয়া মানস হতে উদ্‌বোধিত, রূপের স্মৃতি ও সুখের শিহরণ।

নন্দলালের জীবনব্যাপী শিল্পসাধনার আভাসসূচিত এই রেখাচিত্র্। রোগদুর্বল শরীরের শ্রান্তি ও অবসাদে শিল্পী আজ নিষ্ক্রিয়বৎ, স্তব্ধ। অথচ মন তাঁর নিষ্ক্রিয় নয় মনে হয়, চেতনা সদাজাগ্রত এবং দৃষ্টি কোন্ দূরে কোন্ হৃদয়গহনে নিবদ্ধ কে বলতে পারে! কয়েক বৎসর পূর্বে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অভ্যস্ত কোনো রীতিতে নয়, এখন আঁকতে চাই সম্পূর্ণ নূতন ক'রে নূতন ছবি। আমার কাছেও সেটি হোক নূতন আবিষ্কার।' সেই 'নূতন'কে দেখবার সৌভাগ্য আজও আমাদের হয় নি। শিল্পী আপন অন্তরে দেখতে চেয়েছেন, হয়তো দেখছেন। অনাবিল তাঁর দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন তাঁর ধ্যান ও ধারণা। তবে, শিল্পীর দেখা শুধু অন্তরে নয়, স্রষ্টার দেখাও যেমন বিশ্ব-ভুবনময়। 'তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির' — চমৎকৃত অন্তরে এই কথাটি যেদিন বলতে পারেন সেদিনই তাঁর চরম সুখ ও সার্থকতা।

শিল্পী মনে মনে নূতনকে আহ্বান করছেন, আমাদেরও প্রত্যাশার শেষ হয় নি।

কলিকাতা। শরৎ ১৩৬৫
পুনর্লিখন : আশ্বিন ১৩৬৯

১ বস্তুতঃ শিল্পীজীবনের নানা পর্যায়ে এমন অনেক ছবি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ, যাকে নানাজাতীয় পট বলা চলে। ১৮৯৫-৯৭ খৃষ্টাব্দে উনিশ-কুড়িখানি কৃষ্ণলীলার পট— তাতেই ভারতীয় নবচিত্রকলার সূচনা। ১৯১১-১৫ খৃষ্টাব্দে যাত্রা-থিয়েটারের রঙকরা নটনটীদের হাস্যোদ্দীপক যে-সব ছবি আঁকেন সেগুলিকেও পট বলা চলবে না কি ? ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ছিয়াত্তর খানি mask বা 'মুখোষ'— মানুষের 'মুখ' যদি ছবি হয়, 'মুখোষ'কে একজাতীয় পট বলা যাবে সন্দেহ নেই। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মনুষ্যপ্রতিকৃতির রচনায় অসাধারণ ব'লেই মুখোষ-রচনাতেও অবনীন্দ্রনাথের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। শিল্পীজীবনের শেষ পর্যায়ে, ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ আঁকেন চণ্ডীমঙ্গলের পট তেত্রিশখানি আর কৃষ্ণমঙ্গল পট বাইশখানি। অতঃপর ছবি আঁকা ছেড়ে দেন বললেই চলে। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পটে বাস্তবতা বেশি পরিমাণেই চোখে পড়ে এবং মণ্ডনগুণও প্রাধান্য লাভ করে না।

২ বিশুদ্ধ ইটালিয়ান ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে আঁকা হয় হলকর্ষণ উৎসবের ছবি, শ্রীনিকেতন উৎসবপ্রাঙ্গণের অন্যতম ভিত্তিগাত্রে। চীনাভবনে যে 'নটীর পূজা' চিত্রমালা আঁকা হয় তাতে আঠা হিসাবে ডিমের সারভাগ ব্যবহার করা হয়েছিল। ফ্রেস্কো এবং অন্যান্য চিত্রণপদ্ধতি সম্পর্কে শিল্পাচার্য-প্রণীত 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা আছে।

কবির ভাষায় বলতে গেলে : নির্জনে নিভৃতে 'আছি'তে 'আছি'তে মৃদুমধুর করতালি বাজছে।···

'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' এ গান যখন সবে রচিত হয়েছে, তারই সুরের রেশে অবনীন্দ্রনাথকে গাইতে শুনেছি গুন্‌গুন্ স্বরে—

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।·
আমার একতারাটির একটি তারে
সুরের বেদন বইতে নারে,
আমার তূলি সইতে নারে
নিখিল রঙের বেদন বইতে নারে—
ওগো, তোমার সাথে বারে বারে
আমি হার মেনেছি এই খেলাতে।

কত যে দরদ, কত বিচিত্র আখর তা বলা যায় না। এ গান তো আসর সাজিয়ে পাঁচজনকে শোনানো নয়, হাতের তূলি হাতে থাকতেই নিজের মনে নিজেকে শোনানো হাতওয়ালা আরামকেদারাটিতে ব'সে— অন্য কে শুনল না-শুনল বড়ো খেয়াল নেই— দক্ষিণের বারান্দায় সবে মাত্র চাঁপারঙ রোদটি এসে পড়েছে, চঞ্চল দুটি চড়ুই নাচানাচি করছে রেলিঙের উপর বা কার্নিশের ধারে, আর বাগানের গাছপালাগুলি দেখা যায় আলোছায়ায় বাতাসে ঝিল্‌মিল্ করছে। কিন্তু, গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিষ্য নন্দলালের সর্বাঙ্গীণ তুলনা তো হয় না। তাই কবির অন্য একটি গানের ভাষায় বড়ো জোর বলতে পারি—

খেলার ছলে সাজিয়ে তোমার রূপের বাণী
দিনে দিনে ভাসাও দিনের তরীখানি।

না, তাও কি বলা যায় ? শিল্পী নন্দলালের শিল্পসাধনায় চিরদিন ছিল একটি শুদ্ধসংযত আরাধনার ভাব, আর আজও আছে। অশীতিবর্ষের কাছাকাছি

এসে শারীরিক শক্তি অল্প, ইচ্ছামত হাঁটতেও পারেন না, আর মানসিক শক্তি সযত্নে সংরক্ষণ ক'রে দিন থেকে দিনে উজিয়ে চলেছেন। অথচ আজ এক বৎসরের বেশি হল সন্থ-আলো-ফুটে-ওঠা সকাল বেলায় নির্জন 'কাঁচের ঘরে', নিজের কাজের ঘরে ব'সে একমনে তূলি ধ'রে দিনের দিন যে ছবিগুলি আঁকছেন— প্রত্যহ প্রভাতে একখানি ক'রে ছবি আঁকেন— 'খেলা' না ব'লে এ কথা বলাই ভালো যে, সে তাঁর পক্ষে প্রকৃতির পূজা, আরাধনা, প্রকৃতির অন্তর্লীন সর্বানুভূ যে চেতনসত্তা তাঁরই পূজা। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পী নন্দলালের চরিত্রগত প্রভেদ। পূজা যেমন বলা যায়, তেমনি বলা চলে 'আমি আছি এবং তুমি আছ, সব হয়েই আছ' এই নিগূঢ় গভীর অবচন বোধ থেকেই একটি সুখ বা সন্তোষ— রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন দুই 'আছি'তে 'আছি'তে অনুচ্চ মধুর করতালির আওআজ— এই যেন রূপের-পূজারি রূপদর্শী নন্দলালের নূতন এই চিত্রধারার নিহিত তাৎপর্য। যে নিষ্ঠা-সহকারে, যেমন নিয়ম-পূর্বক, ভক্ত বা সাধক প্রতিদিন ইষ্টের ধ্যানধারণা আরাধনা করেন, বুঝি তারই সঙ্গে এর অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্য।

এই হল শিল্পীপ্রকৃতির বিশেষ পরিচয়। এই চিত্ররূপের বিশেষ প্রকৃতি কী সেটিও প্রণিধানের বিষয় আর বড়োই চমৎকারজনক। শ্রেষ্ঠ কাব্যে দেখা যায় নিরলংকৃত স্বভাবোক্তির ভাবলাবণ্য ও চমৎকারিত্ব। আমরা আলংকারিক নই, সংজ্ঞার্থ মিলিয়ে নির্দোষ উদাহরণ অবশ্যই উপস্থিত করতে পারব না। তবু, নানা যুগের নানা কবির রসাত্মক বাক্য অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।—

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তখনি বন্ধু, তোমার লাগিয়া
বেঁধেছিনু অঞ্জলি

এ উক্তিতে অলংকারের বাহুল্য কী আছে? তেমনি—

আমি যে সইতে পারি নে,
সুরে বাজে মনের মাঝে গো,
কথা দিয়ে কইতে পারি নে

অথবা—

রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়

এই সব ছত্র কি সত্যই নির্ভূষণ নয়? আছে অনায়াস অব্যর্থ ছন্দ, অন্তর্নিহিত সুর, আর অনির্বচনীয় কত ভাবের অনুষঙ্গ। তাইতেই রসিকচিত্তের দূর-দূরান্তর অবধি শিহরণ জাগে, জন্ম-জন্মান্তর বুঝি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। জানকীর স্পর্শসুখে শ্রীরাম যখন বলেন—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।

'সুখ বা দুঃখ বুঝি নে স্বপ্ন অথবা জাগরণ, বিষের না অমৃতের এই প্রতিক্রিয়া।' নব অনুরাগে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা বলেন—

আস্তাং তদীয় নবযৌবনপূর্ণবাপী
কাপীয়মত্র ন করোমি নিমজ্জনেচ্ছাম্।
ইচ্ছামি তং কমপি কালমলজ্জমুচ্চৈঃ
আক্রন্দিতুং, সুমুখি, হা প্রিয় হা প্রিয়েতি।

'নবযৌবনলাবণ্যে আপূর্ণ শ্যামসায়র আমার সামনে, আমার ভাগ্য হবে না, সখি, নিমজ্জনস্নানে নেমে যেতে, ঝাঁপ দিতে? ওরই নির্জন কূলে বসে 'হা প্রিয়' 'হা প্রিয়' বলে অলজ্জ উচ্চকণ্ঠে একবার কাঁদতেও কি পাব না?'— এ-সব ক্ষেত্রেই অতিশয় সাদাসিধে ভাষায় অতি গভীর আনন্দবেদনাকে ব্যক্ত করা হয়েছে— আলংকারিকেরাই বলতে পারেন সর্বশেষ দৃষ্টান্তে সাঙ্গরূপকের একটা অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারানো হয়েছে কি না— আমরা জানি কোনোরূপ কারুকৌশলে, ভাব ও ভাষার সুনিপুণ সজাগ প্রয়োগে, ঝলোমলো ঐশ্বর্যে, যেন এর শতাংশের একাংশ সাড়া জাগানো যেত না রসিকহৃদয়ে। আমরা জানি পরিপূর্ণ কলসের মতো অন্তঃকরণ যদি ভরা থাকে অলক্ষ্য রূপরাগে বা রসে, একটু হাত ঠেকালেই, এতটুকু হেলানো হলেই, উছলে পড়ে রস। এই অলৌকিক রস শুক্‌নো জমিতে প'ড়ে শুষে যাবার নয়, নষ্ট হবার নয়— এ যে আপন আধার আপনি সৃষ্টি করে আর তখনই লক্ষগোচর হয়ে রসিককে বিস্মিত পুলকিত করে।

কবি বা শিল্পীর এই হল সিদ্ধ অবস্থা। জরার অধিকারে দেহ হয়তো জীর্ণ এবং পুরাতন, কিন্তু আসক্তি-ক্ষ'য়ে-যাওয়া অনুরাগ-ধোওয়া দৃষ্টির ঝরোখায় বসে আছে যে জন, বাল্যে কৈশোরে বা যৌবনে যেমন ছিল আজও সে তেমনি নবীন, হয়তো নবীনতর। দৃষ্টি হয়তো অন্তর্দৃষ্টিই হবে। চোখে দেখার যা-কিছু অভাব বা অপূর্ণতা, মনের দেখায় আজ সে-সবই ছাপিয়ে গিয়েছে। চীনা-জাপানীরা এ তত্ত্ব বিশেষভাবেই বোঝেন। রূপ-কলায় পারগামী হতে হলে বিধিদত্ত প্রতিভা তো চাই-ই, আরও চাই সুদীর্ঘ জীবনের একাগ্র এবং অনবচ্ছিন্ন অনুশীলন —এ তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলেই জানেন। তাই বুঝি রূপরচনার জাদুকর হকুসাই বলেন অশীতি বৎসর বয়সে: রূপের মর্মে আজ আমার প্রবেশলাভ ঘটেছে মনে হয়, আরও আশি বৎসরের পরমায়ু পেলে এমনও হতে পারে 'চিত্র-পটে যে ফোঁটাটি ফেলব— যে রেখাটি টানব— সবই কথা কইবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে'। আচার্য নন্দলালের রূপকলা-ব্যাখ্যানে এই চমৎকার উক্তিটি সংকলিত হয়েছে আর তাঁরই সাম্প্রতিক রসরূপ-সাধনার আলোচনায় এ উক্তির প্রাসঙ্গিকতা অল্প নয়।

অসুস্থ দেহের বাধা একটা আছেই এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সে বাধা সত্ত্বেও আনন্দঘন সত্তার প্রকাশ নির্ভূষণ সহজ বেশে, বেশি বৈ কম নয় তার স্বভাবসৌন্দর্য। এই কথাটাই এ পর্যন্ত নানাভাবে বলতে চেষ্টা করা গেছে। শিল্পী বলেছেন, একটু বাড়িয়েই বলেছেন আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই: বহুদিন ধ'রে তাঁর ছবিতে ছিল একটা লড়াইয়ের ভাব। ভারতের প্রাচীন রূপরচনার ভাব এবং আদর্শ, সাধনা এবং সিদ্ধি, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা চাই অতুল মহিমার উন্নত বেদীতে —মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর সর্বদাই ছিল। তিনি বলেন অবনীন্দ্রনাথে এ ভাব ছিল না বললেই হয়; তাই ফুল ফোটা আর আলো ফুটে ওঠার মতোই সহজ সুন্দর তাঁর অধিকাংশ ছবি— সে যেন ছবি করা নয়, ছবির হওয়া— আপনাকে আপনি যেন রচনা করেছে ছবি। (স্বতই তুলনা মনে আসে: স্বামী বিবেকানন্দে যে যোদ্ধৃভাব ছিল সেটি ছিল না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে।) কিন্তু, শিল্পী যাই বলুন, আমরা জানি, নন্দলালের চিত্রকৃতিতেও উত্তরকালে

এই তন্ময়তা এই স্বাভাবিকতা উপজাত এবং ক্রমউপচিত হয়ে আজ তাঁর ছবিতেও সৃজন করেছে একটি অবিশ্লেষণীয় ভাবলাবণ্য, রূপদক্ষ শিল্পীর বশীকৃত বর্ণতূলির দান রূপলাবণ্য সেটি নয়। এই গুণ কালে কালে বিস্ময়করভাবে ফুটে উঠেছে— নটীর পূজায়, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে, প্রত্যাবর্তনে, গাছে-চড়া শবরীকন্যায়, কৃষ্ণকলিতে, আর পোয়ে নাচের ছবিতে গতিরাগের অপূর্ব গানে। বিস্তারিত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ছাত্র নন্দলালের অতি পুরাতন চিত্র 'সতী'তে বা 'শিবসতী'তে আত্মবিস্মৃত এই ভাবলাবণ্যের কিছুমাত্র ন্যূনতা নেই। গভীর গম্ভীর সৌন্দর্য আছে, লোক-দেখানো কোনো নৈপুণ্য সেখানে নেই।

তবে আজই যে তাঁর ছবি বিশেষভাবে সহজ হয়েছে, একেবারে ভূষণহীন হয়েই সুন্দর হয়েছে, কেউ ভালো বলে বা না বলে সে ভাবনা চিত্তপট আর চিত্রপট থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে, নিছক ইষ্টআরাধনায় উৎসর্গ করেছেন শিল্পী আপনার রঙ তূলি আর অবশিষ্ট শক্তি, প্রতিটি ছবি তার অন্তিম মূল্য পেয়েছে শিল্পীর 'স্বাক্ষর' হৃদয়ে ধারণ ক'রে— শিল্পীর পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তিসত্তার, নৈর্ব্যক্তিকতার-সীমান্তে-উপনীত ব্যক্তিসত্তার, নিগূঢ় পরিচয় সর্বাঙ্গে বহন ক'রে— এজন্যই বিশিষ্ট হয়েছে, অন্যের অনুসরণের বা অনুকরণের অতীত হয়েছে —এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনোরূপ তুলনায় আলোচনার সুযোগ নেই, বিচার বিশ্লেষণ নিষ্ফল, বার বার শুধু এই কথাই মনে ওঠে—

বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।

সেই সাধনার পরিণামেই এই সিদ্ধি। মনে হয়— যা সব চেয়ে সহজ তাই সব থেকে গভীর, গম্ভীর, তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশভুবনব্যাপী কত আয়োজনের পরিণামে ঘাসের ডগায় এক ফোঁটা শিশির দেখতে পাই! আর, ফুল?—

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী!

নন্দলালের আলোচ্য ছবিগুলি, কদাচিৎ একটু আধটু রঙ-ছোঁয়ানো হলেও, মোটের উপর সবই প্রায় কালী তূলি দিয়ে আঁকা। চীনা কালী আর ভারতীয় তূলি। অর্থাৎ, চৈনিক কালো কালীর ছাপ-ছোপে ও রেখায় আঁকা হলেও, সেই বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা হলেন ভারতীয় শিল্পী, ভারতেরই বিশেষ ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রবীণ, পরিণত। চীনারাই বলে থাকেন, 'কালীতূলির কাজে তূলিকারই প্রাধান্য, কালী তার সহকারী।' রঙ বা কালী সম্পর্কে চিত্ররূপের অভিজ্ঞ সমঝদার মাত্রেই যা অনুভব করেন সেটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়, এখানে সংকলন করা যেতে পারে—

> বর্ণ মেশায় না চোখ, বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্জ্বল বা ম্লান দেখিতেছে তাহারই ওজনটুকু নীলে মেশানোই বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি কালী দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি, যদি মনের রঙটুকু সেই কালীতে মেশাই। কালী তখন আর কালী থাকে না, যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে।
>
> 'কালী কি কালো? [শ্রীকৃষ্ণ কি কালো?]
> দূরে তাই কালো।
> চিনতে পারলে আর কালো নয়।'[১]
>
> মন যতক্ষণ কালী হইতে পৃথক আছে, কালী ততক্ষণ কালো কালী মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালী আর কালো নাই, সে ষড়ঙ্গের বরণডালায় আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

চিত্রকারী শিল্পীর প্রকৃষ্ট উপায় ও উপকরণ-স্বরূপ বর্ণ আর সর্ববর্ণাত্মক কালী সম্পর্কে এ থেকে অধিক আর কিছু বলবার নেই। এ যেমন চীনা-জাপানী শিল্পীগণের উপলব্ধির সঙ্গে মেলে, তেমনি দেখা যায় ভারতের যোগী বা ভক্তদের অপরোক্ষ দর্শনের সঙ্গে, সত্যদর্শনের সঙ্গেও অভিন্ন। আর, শেষ বয়সে তাই শিল্পী নন্দলালও চলেছেন উত্তরোত্তর কালোর সরণীতেই আলোর অভিসারে— তারও বাইরে-বাইরে-পরিদৃষ্ট বা আবিষ্কৃত

কার্যকারণের অতিরিক্ত অন্য আন্তরিক হেতু ও সার্থকতা অবশ্যই আছে। হয়তো সে বহু থেকে একের দিকে মুখ ফেরাবার ইচ্ছারই ইঙ্গিত করছে। এই অজস্র চিত্রের ধারায় শিল্পীর বিশেষ একটি মানসিক অবস্থা, একটি আত্মিক স্থিতি, ফুটে উঠেছে। সেটি 'বোধে বোধ'[১] করা যেমন সুনিশ্চিত ব্যাখ্যা করা অথবা বর্ণনা করা তেমনি দুরূহ। বোধ করি শ্রেষ্ঠ সংগীতের সমে পৌঁছে যে ভাব অনুভব করা যায়, অন্তরের তেমনি একটি শমরস বা শান্তি নির্‌ভূষণ রূপসৌষম্যের আধারে আমাদের অনুভবগম্য হয়েছে। সংগীতজ্ঞ আমরা নই, তবু এমন আমাদের মনে হয় যে, ঐ সমের অস্থির স্থিতিকালে মৌনের অন্তরেই সম্পূর্ণ সংগীতের ছন্দ সুর ও ভাবসুষমা ধরা দিয়েছে— আলোকপ্লাবিত অতিদূর আকাশে একবার স্বর্ণডানা দুটি সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে ঈগল যেমন স্থির অচঞ্চল হয়ে থাকে। গতি ও স্থিতির নিত্যদ্বন্দ্বের ক্ষণিক অবসান।

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই নিখিল সৃষ্টির প্রতি পদক্ষেপ। রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। অন্তর-বাহিরের অন্য অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়াও চিত্রে আছে রূপ ও রঙের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, সংস্থিতি আর সমন্বয়। নন্দলালের বর্তমান চিত্রপর্যায়ে রঙগুলি সবই যখন সংহৃত হয়েছে কালো কালীতে, নিখিল রূপের উদ্ভব ও বিলয়ের অন্তর্‌বর্তী যে দ্বন্দ্বটি বিশেষভাবে আমাদের নয়নগোচর সে হল গতি ও স্থিতি নিয়ে। ভাব যখনই নির্দিষ্ট কায়ার দুকূল প্রহত করে ছুটেছে, তারই ছন্দোবেগের পদে পদে, মন্দ বা দ্রুত লয়ের উত্থানপতনে, এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, অথচ এমন ভাবে আর কখনো আমাদের চোখে পড়ে নি— কেননা, এমন রিক্ততার ভূমিকায় তা আর কখনো প্রকাশ পায় নি। গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকেই শিল্পীর ঝোঁক বেশি, পরিণামে তারই বিশেষ ব্যঞ্জনা। মনে হয়, নদী পৌঁছুল সাগরসংগমে, মিলনের মোহানাটিতে। অথবা পূর্বোক্ত উপমারই আর একবার উল্লেখ করে বলা চলে— গতি ও স্থিতির পরমাশ্চর্য একটি সাম্য-অবস্থায় পৌঁছে এই চিত্ররূপ বিরাজ করছে অতিদূর আকাশের প্রসারিতপক্ষ গরুড়ের মতো। বিভিন্ন দৃষ্টান্তযোগে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে যত্ন করা যাক।—

'জলপ্রপাত' ছবিটির গতি হল প্রাণ। সমস্ত ছবিটি যেন, সর্বাঙ্গে সর্বতোভাবে চলিষ্ণু যে বারিরাশি তারই অবিরত অশ্রুত সংগীত। মাছগুলি চলেছে স্রোতের উজানে। কলরোলে প্রধাবিত শতধারার তরলস্বর কানে শোনা যাচ্ছে না সে কি শুধু এজন্যই যে ছবি স্বভাবতই নিঃশব্দ? স্বপ্নে যখন ঝড় ওঠে, মহীরুহ ভেঙে পড়ে, এমন-কি ভূমিকম্পও হয়, সবই দেখায় বাস্তববৎ, তবু কোনো শব্দ শোনা যায় না; প্রাণ খুলে আলাপ করা যায়, এমন-কি হয়তো চীৎকার করা হয়, তবু সে যেন মনের সঙ্গে মনেরই অব্যবহিত সংযোগে, শ্রবণেন্দ্রিয় দুটির কোনো কাজ থাকে না; আর স্বপ্নে এমন ছুটে যাওয়ার বা উড়ে যাওয়ার ব্যাপারও কি স্মরণ হয় না যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো শ্রমসাধ্য চালনার প্রয়োজন থাকে না— সবটাই যেন অনায়াস ভেসে যাওয়া, যে ভাবে শরতের শুভ্রমেঘ ভাসে নীলাকাশে। আমরা শুনেছি— শান্তিনিকেতনের উত্তর সীমানায় নূতন খালের জলে যে প্রপাত সৃষ্টি করা হয়েছে সিমেণ্ট্-বাঁধানো 'ঢল' বেয়ে, তাই শিল্পী একদিন দেখে এসেছিলেন। শিশুর দৃষ্টি আছে বয়স্কের চোখে, তাই ভালো লেগেছিল সন্দেহ নেই, অথচ একটা 'কিন্তু' থেকে গিয়েছিল এই যে এ তবু কৃত্রিম, লীলাময়ী প্রকৃতির অলক্ষ্য হস্তের রচনা নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসলেন তাঁর নিভৃত ঘরে নিজের আসনে, বাস্তব তাই বুঝি রূপান্তরিত হল স্বপ্নে; এ শুধু জলপ্রপাত নয়, সেই সঙ্গে স্বপ্নপ্রপাতও বটে— 'চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে'। বিশেষ ক'রেই বর্তমান পর্যায়ের ছবিতে শিল্পী দিনের পর দিন এঁকে যাচ্ছেন দূরের ছবি— দেশ কাল মানসিকতা সব দিক দিয়েই দূর, দূর অথচ মধুর। অতি নিকটের বাস্তবকেও তাই আপন মনের অনুকূলে, মূডের বশে, অতি দূরের করে নিয়েছেন।

পাঁচটি পুঁটি মাছের ছবিতে মাছ ক'টির চোখের কোণে কোণে বা কান্‌কোয় একটু-আধটু লালিমা ছোঁয়ানো আছে, ভস্মে-ঢাকা এক-আধ-রতি বহ্নিদীপ্তির মতো। প্রাচীন চীনা চিত্রকরেরাও কালীতূলির ছবিতে রঙের এমন ব্যবহার করেছেন, এ না হয় প্রসঙ্গতঃ বলা গেল। ছবিটিতে দেখছি কী? জলতলের 'শৈবাল' বা উদ্ভিদ্ অবিরতগতি স্রোতে অধীরভাবে

কাঁপছে অস্তিত্বের সুখে, আর সেই স্রোতে সেই একই বিশুদ্ধ 'অস্তি'র আনন্দে ছোটো বড়ো মাছ ক'টি স্রোতের বিপরীত মুখে স্থির হয়ে রয়েছে। তারা চলছে না; যে তাদের জীবনের জীবন, আবাস ও আধার -স্বরূপ, অদৃশ্যপ্রায় স্বচ্ছ প্রবাহে সে'ই চলেছে অবিরল স্পর্শসুখে তাদের সর্বাঙ্গ প্লাবিত ক'রে— স্থির মাছগুলির অপলক অক্ষিতারায়-তারায় চকিত ঝিকিমিকি অনুমান করলেও করা যায়।

গিরিসংকটে তিনটি হনুমান বা গিরিব্রজে সানুসোপানে-অধিষ্ঠিত গুটি-তিন বাংলো ছাঁদের বাড়ি, এ যেন আর-এক প্রকারের চিত্র। পরিবেশ আর পরিপ্রেক্ষিতের বদল, আর সেই সঙ্গেই শিল্পীর আত্মপরিচয়ের নূতন দিকও যেন উদ্‌ঘাটিত। প্রথমোক্ত চিত্রে রুক্ষকঠিন তৃণতরুহীন পাষাণের সংহত স্থৈর্য আর তারই ক্রোড়ে তিনটি প্রাণী— তাদের আকারে অবয়বে বা ভঙ্গীতে প্রাণচঞ্চলতা অল্পই। পাথরে আর প্রাণীতে রূপের বৈপরীত্য বা বিশিষ্টতা (character) ফোটাবার প্রয়োজনে, বর্তনাপ্রয়োগে বা রেখাবিন্যাসে যেটুকু প্রভেদ না থাকলে নয় তাই ব্যবহার করেছেন শিল্পী; সে এতই অল্প যে মনে করা যেতে পারে এই পাথর ভেদ ক'রেই এই প্রাণ জেগেছে। রূপে ও ছন্দে সব নিয়েই আশ্চর্য একটি ঐক্য বা অবিচ্ছিন্নতা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ছবিটির একটি স্বয়ংসিদ্ধ সম্পূর্ণতা ও অবিচল স্থিতি আছে। অন্য ছবিটিতে পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে এক দিগন্ত থেকে না-দেখা আর-এক দিগন্তের অভিমুখে। সেই অজ্ঞাত সুদূর থেকেই আঁকা-বাঁকা জলের ধারা বয়ে আসছে। এ দিকে নিকটের পাহাড়ে ঋজুদণ্ডায়মান দেওদার-বীথি আকাশে উন্নত মাথা তুলেছে, তাদেরই রহস্যছায়াশ্রিত বাড়িগুলি অনড় দুর্গ-সদৃশ। স্বতন্ত্র স্বৈরগতি জীবনের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখি নে, তাতে প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর নির্লোভ নিরাসক্ত বৈরাগ্য; জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যে যিনি পূর্ণ, আকাশের নিঃসীম শূন্যতাতেও তাঁরই প্রকাশ, এই যেন বলতে চায় নির্জন বাড়িঘর, স্থির দেওদার আর স্থিরতরঙ্গাকারে দিগ্‌দিগন্তে উত্থিত পর্বতশ্রেণী।

নূতন দৃশ্যপটের উদ্‌ঘাটনে দেখি 'শ্যামলী' মেয়েটিকে— কোথা তার ঘর, কী ভাবে বসে আছে, কোনোদিন জানা যাবে না। শুধু জানি আপনাতে

আপনি সে ডুবে আছে; আপনাতে আপনি স্থিত, বিধৃত। সে আছে এইমাত্র তার পরিচয়ের সীমা নেই, শেষ নেই।

চিরতুষারাবৃত ধবলগিরি, সেখানে কোনোদিন কোনো মানুষের পদপাত ঘটবে না; শান্ত সমাহিত যোগেশ্বর শিবের সে ধ্যানাসন। সেই ধ্যান-লোকের দূরলক্ষ্যের অভিমুখী হয়ে নিঃসঙ্গ বৃক্ষরূপী কোন্ শৈব তপস্বী। নিম্নবাহিনী কোনো উৎসতল থেকে দিনান্তের ঘট ভ'রে নিয়ে শৈলসোপানে উঠছে ধীর মন্থর পদে দুটি পাহাড়ের মেয়ে, উপরের অধিত্যকাভূমে দেখা যায় একটি কুটীর। সমস্ত ব্যাপারটি ঘটছে অতিদূর অন্য কোনো জগতে। এখানে ঘটনাই যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাও নয়। অস্থির ক্রিয়ার পরিবর্তে সুস্থির হওয়ার মহিমাই রূপ ধরে জেগে উঠেছে এই চিত্রে— গিরীশের হিমমৌলি চিরশুভ্র কয়েকটি শিখর।

সব শেষে আর একটি মাত্র চিত্রের উল্লেখে অবর্ণনীয়ের নিষ্ফল বর্ণনচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হব। জনশূন্য এক মগ্নশৈলের কঠিন পাষাণে মাথা কুটছে অহেতু আক্রোশে তরঙ্গগর্জিত স্ফুরিত ফেনায়িত মহাসিন্ধু— আকাশ থেকে আকাশে তখন বায়ুবৃষ্টির মাতামাতি, শ্রেণীবদ্ধ তালের বনে বনে তির্যক্ বারিবর্ষণ। আক্রোশ বলেছি বটে, হয়তো নয়— শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে নেচে উঠেছে সমুদ্র তাণ্ডবমত্ত শঙ্করের পদপাতে। বিশেষ দ্রষ্টব্য দুটি কাঁকড়া, সমুদ্রের তরঙ্গদোলা থেকে উঠে পড়েছে ফেনার্দ্র শীতল পিছল পাষাণগাত্রে। জড় এবং জীব মিলে অভিন্ন একটি রূপ ও রেখার 'ছন্দ' (pattern), যেমন অন্য ছবিতেও দেখা গেছে। গাছ এবং প্রাণী এক দিকে, আর-এক দিকে অন্ধ জড়জীবনের, দৃশ্যঅদৃশ্য ভূতসংঘের দুর্বার আবেগ ও বিপুল উল্লাস— পাষাণরূপিণী সর্বংসহা পৃথিবী, অস্থির সমুদ্র, বৃষ্টি, এবং বায়ু, যা চোখে না দেখেও মনে প্রাণে অনুভব করা যাচ্ছে। আরও রয়েছে জানি সর্বত্র প্রসারিত, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, আকাশ— সেটি তো চিত্রীর চিত্ত বা চেতনারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং এত যে আবেগ এবং গতি, তার অন্তরে রয়েছে অবিচল স্থিতি ও শান্তি এ আমাদের কবিকল্পনা মাত্র নয়। এই হল শিল্পী নন্দলালের আয়াসহীন কৃতিত্বের পরম পরিসীমা, তাঁর নবতন চিত্রপর্যায়ের বিশেষ গুণ।

রচনার দিক দিয়ে সমকালীন হলেও, রূপশৈলীর দিক দিয়ে পূর্বকালীন

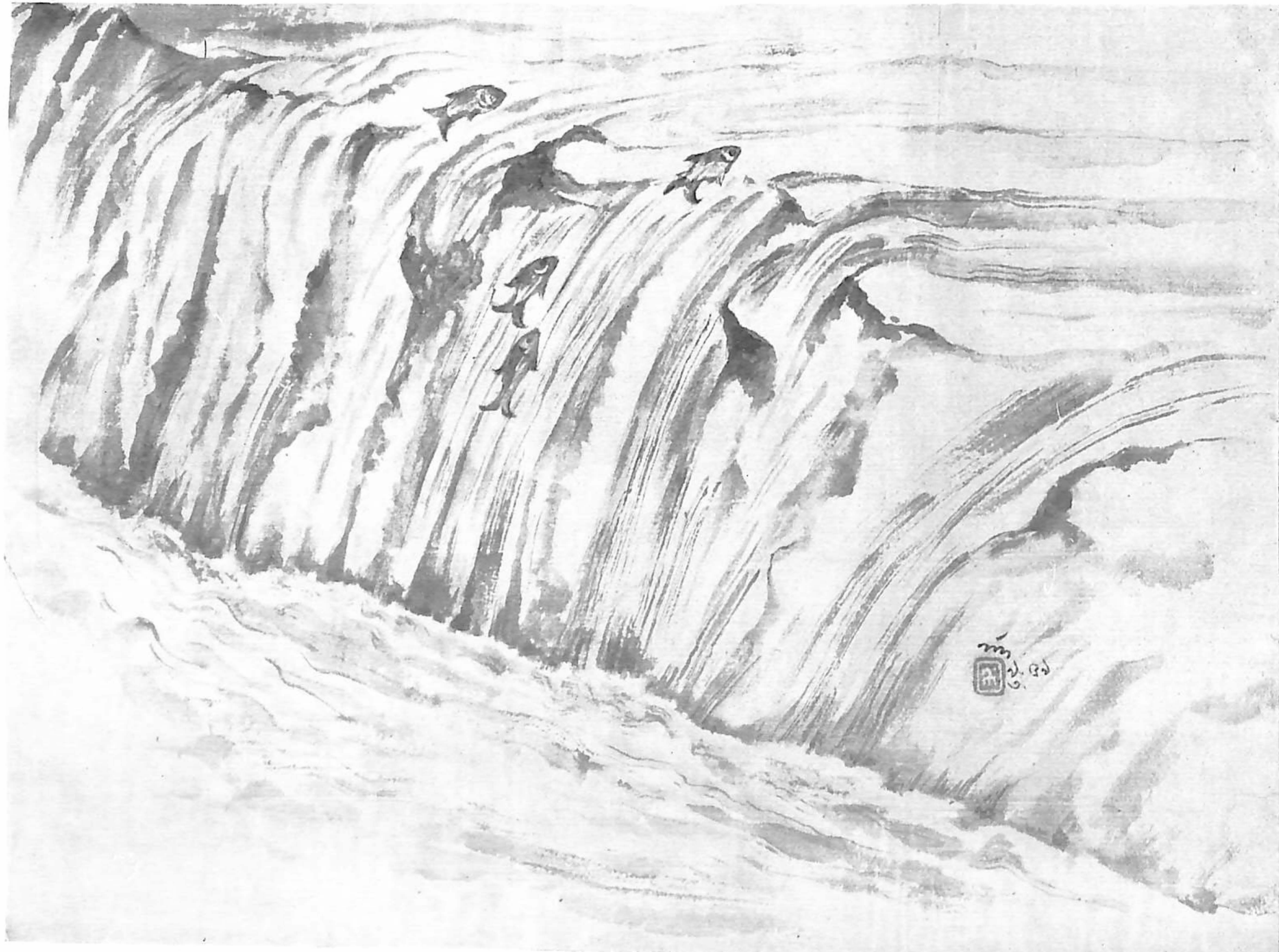

জলপ্রপাত
১৯৫৯

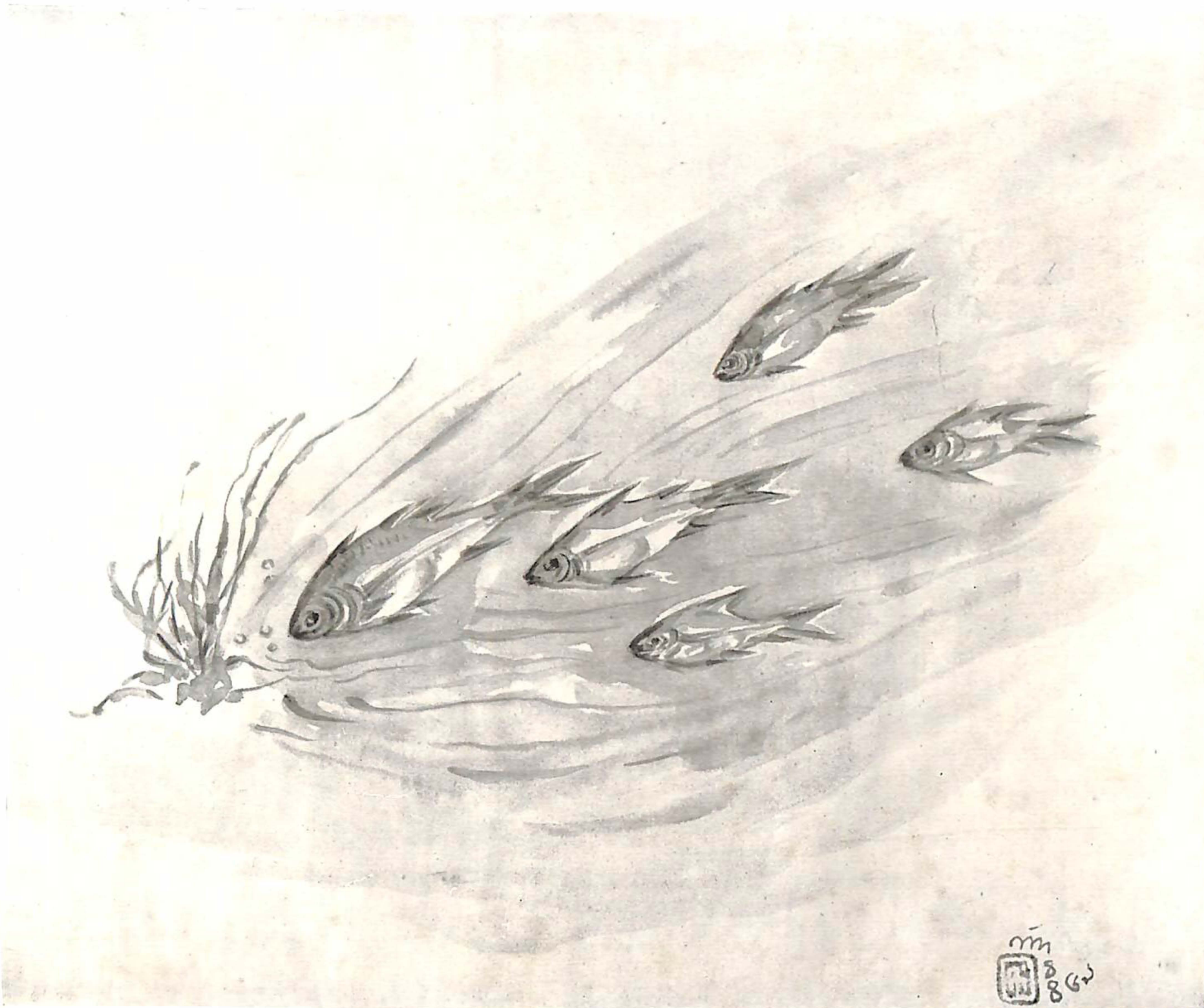

পুঁটিমাছ
এপ্রিল ১৯৫৯

স্কেচ বা কার্ড্ স্কেচের সগোত্র, 'খেজুর রসের ভিয়ান' ছবিটি আমরা ঠিক এই চিত্রপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করি নে। অন্যান্য ছবির তুলনায় এ যেন নিকটতর পরিচয়ে পরিচিত, অপেক্ষাকৃত বস্তুভারযুক্ত বা বাস্তব। এর রস একটু আলাদা। সমতলে যে বাতাস আমরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে গ্রহণ করি আর সূক্ষ্মতর শুদ্ধতর যে বায়ুমণ্ডল চিরহিমাবৃত গিরিশিখরে, উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান, অনুরূপ একটি পার্থক্য দেখা যায় শিল্পী নন্দলালের সেকালের এবং একালের ছবিতে। ভালো মন্দের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, রসাস্বাদের তবু ভিন্নতা বা বিশিষ্টতা আছে।

এক কালের আঙিনায় আর-এক কালের রূপ, বিশেষতঃ ভাবীকালের "অপরূপ", তারই নিদর্শন হিসাবে নন্দলালের আর-একখানি ছবির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক যুগ অতীত হয়েছে, খৃষ্টীয় ১৯৪৭ সনের শারদীয় অবকাশে, উড়িষ্যার গোপালপুরে, রঙতুলি-যোগে ক্ষুদ্র কার্ডে নন্দলাল এঁকেছিলেন শ্যামসমুদ্রের কয়েকটি ঢেউ। শুধুই ঢেউ। মাঝসমুদ্রের এক প্রকার পরিচ্ছিন্ন রূপ বা ক্লোজ-আপ, এ ছাড়া অল্প পরিসরে আর কিছুই দেখানো হয় নি, দেখাবার প্রয়োজনও ছিল না। 'অপ্রাণ' নিসর্গের যা-কিছু আত্মনিমগ্ন উদ্‌বেলতা, অকূল সমুদ্রের দিক্‌শূন্য আনন্ত্যের যা-কিছু সম্ভবপর ব্যঞ্জনা, সবই অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ঐ চিত্রে— শিল্পীর কোনো সচেতন প্রয়াসে নয়, রঙতুলির কোনো নির্ধারিত কৌশলে নয়— কেমন ক'রে, তা কোনো শিল্প-সমঝদার বলতে পারবেন না আর শিল্পী নিজেও জানেন না। সাম্প্রতিক চিত্রপর্যায়ের যে গুণে আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট, মনে হয়, সে গুণেই ঐ কার্ড্‌খানিও দীপ্তিমান। কাব্যের রসধ্বনি যেমন সকল বিচার-বিশ্লেষণের অতিরিক্ত, রূপের এজাতীয় ভাবব্যঞ্জনাও তদ্রূপ।

প্রাচীন বয়সের এই একটা সুবিধা আছে যে, যথাকালের যথোচিত কৃত্যগুলি সমাধা হয়ে থাকলে মানুষকে ক্রমেই সে মুক্তি দেয় সকল দায়িত্ব থেকে, 'বিষয়'চিন্তা বা দুশ্চিন্তা থেকে। এটি স্বভাবতই বৈরাগ্যের কাল আর ব্যাপ্ত অনুরাগের কালও বটে। প্রায় নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ। তেমনি স্থির অনুরাগ থেকে, সর্বব্যাপিনী 'জীবভূতাসনাতনী' প্রকৃতি -পূজার নিষ্ঠা

থেকে, নন্দলাল আজ বর্ষাধিককাল যে ছবিগুলি আঁকছেন তার বিষয়বৈচিত্র্য আছে অনেক, প্রকরণের ভিন্নতা ঘটেছে মাঝে মাঝে, অথচ মতি বা মনোভঙ্গীর অভিন্ন একটি বিশেষত্ব প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এ কথাও বলাই বাহুল্য যে, এই অজস্র চিত্রকৃতির ভিতর থেকে কয়েকখানি ছবি বেছে নেওয়া চলে কেবল চোখ বুজে— চোখ চেয়ে প্রায় দিশেহারা হতে হয় দিকে দিকে চেনা-অচেনার হাতছানিতে। চেনার অন্তরেই ছিল অচেনা।

প্রাচ্য ছবি সহজেই হয় স্মৃতি থেকে, কল্পনা থেকে। নন্দলাল বলেন সুজাতার ছবি করেছিলেন একাসনে ব'সে। গুরু অবনীন্দ্রনাথ বেহারে দেখেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় খোলার ঘর থেকে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে, পিতলের বোক্‌নোয় দুগ্ধধারের শব্দ— তাঁর বলার গুণেই শিষ্যের মনে প্রথম সুজাতার ছবি ফুটে উঠেছিল। তেমনি মুঙেরে কাট্‌নির জঙ্গলে দূরে কোথাও বাছুরের হম্বারব আর গাইয়ের হাম্‌লানো, তা থেকেই ছবি হয়েছে উৎকণ্ঠিতা পয়স্বিনী গাভীর। শিল্পী উপস্থিত যে ছবিগুলি আঁকছেন সেগুলিও স্মৃতিচিত্র বলা যায়, তবে সে স্মৃতি বহু দূরের স্মৃতি, যেন বা আরএক জগতের আরএক জন্মের। কবে কাছারিবাড়ির দুয়োরে বাঁধা ছিল ধূমল পাহাড়ের মতো বিশাল রাজহস্তী, কবে দেখেছিলেন ইলামবাজারের খোড়ো ঘরে ঘোর-ঘোর অন্ধকারে আর প্রদীপের আলোয় নিরিবিলি ব'সে পান সাজছে একটি বউ, স্বাধীন সচ্ছন্দ ময়ূর চরে বেড়াচ্ছে বনে পাহাড়ে, ভাগীরথীর পরিচিত একটি বাঁকে অতিপরিচিত এক ষ্টীমার-ঘাট, জটা-পাকানো বুড়ো বটের তলায় জলসত্রে আসীন আদ্যি কালের এক বুড়ো— দেশ-বিদেশের পথ ঘাট, গাছপালা, মানুষ পশু, পাহাড় বন, নদী সায়র সমুদ্র— মনের নয়নে একের পর আরএক ভেসে ওঠে— কিছুই লুপ্ত হয় নি, তবে সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত হয়েছে সে তো সত্যই আর সেই তার বিশেষ সার্থকতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি, শিল্পীর মনের একটি দূরাপসরণ, মানসিকতার ঈষৎ একটি পরিণতি বা পরিবর্তন, এজন্যই তাঁর চিত্রের অচ্ছিন্ন ধারাতেও নূতন রূপগুণ, নূতন লক্ষণ ফুটে উঠেছে— শারীরিক অস্বাস্থ্য বা দুর্বলতা এর মূলকারণ নয়। প্রকরণের দিক দিয়ে এই পরিবর্তন দেখছি যে, মৌলিক রূপ, আর অনেক সময় মৌলিক রূপও নয়— মৌলিক ভাব, সেইটি ফুটিয়ে

তোলার দিকেই শিল্পীর যা-কিছু অভিনিবেশ। রসের দিক দিয়ে প্রায় সব ছবিতেই দেখি একটি শান্তি, স্থিতি, বিরতি, দূরত্ব এবং "পরত্ব", অর্থাৎ এক প্রকার বস্তুতন্ত্র নৈর্ব্যক্তিকতা। যেন আরএক জগতের আরএক জন্মের সব দেখা। আমার বা তোমার বা বিশেষ ক'রে মানুষের বসবাসের জগৎ যেন নয়, পরন্তু "ঈশাবাস্য"— সর্বগত ঈশ্বরের আবাস। এক ভাবে বলা যায়— যা স্থূল তাই সূক্ষ্মে, যা বিশেষ তাই নির্বিশেষে, যা আকার তাই নিরাকারে মগ্ন এবং বিধৃত। এ হয়তো দেশে দেশে আর যুগে যুগে উৎকৃষ্ট চিত্রের অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে একই কালে এমন প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় আর কখনো প্রকটিত হয় নি। নিকট কখনো এমন দূরে বিলীন হয় নি।

দূর শব্দেই কী মায়ামন্ত্র আছে জানি নে। সেই দূরে শোনা যায় অশ্রুত কুহুরব—

breaking the silence of the seas
among the farthest Hebrides

ভূগোল-বিবরণে যার কোনো ঠিকানা পাই নে। সেই দূরে নাইটিঙ্গেলের গানে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সিন্ধুহৃদয়ে চকিতে ঝরোখা খুলে যায় পরীলোকের। সেই দূর দূরান্তরের আকাশই অলক্ষ্যে শিউরে ওঠে সহসা অনাহত অশ্রুত-গম্ভীর এই মন্ত্ররবে—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা,
অন্য কোন্‌খানে!

অথচ এই 'দূর' আমাদের কবিকে যদি বা আকুল ক'রে থাকে, যে কবি আশৈশব 'সুদূরের পিয়াসী', শিল্পীকে করেছে শান্ত, বিবিক্ত, স্থিতধী।

ছবি যখন কবিতার ছত্র স্বতই মনে এনে দিল এখানে আরও এইটুকু বলা দরকার— কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের মনে দূরের ইন্দ্রজাল বিছিয়ে দিয়েছে অতিনিকটের অতিসাধারণ একটি দৃশ্য; কীট্‌সের স্বপ্নচারী বিমুগ্ধ হৃদয়ও যুগে-যুগান্তরে দেশে-দেশান্তরে ফিরেছে একান্ত কাছের শ্যামান্ধকারে প্রচ্ছন্ন সুধাবর্ষী এক বিহগকণ্ঠস্বরে; আর কবি রবীন্দ্রনাথের দূরতম প্রয়াণের

সূত্রও কিছু দূরে নয়। অর্থাৎ, দিব্য ভাবে ভাবিত কবি ও শিল্পীর নয়নে মনে নিকটই দূরের আবির্ভাবে পরমাশ্চর্যের আধার হয়ে ওঠে, পরিচিতই হয়ে ওঠে সকল পরিচয়ের অতীত। বস্তুতঃ শিল্পী নন্দলালের এই ছবিগুলি দেখার অভিজ্ঞতার পরে চেয়ে চেয়ে দেখেছি এক শরৎসন্ধ্যায় ধানক্ষেতের শান্ত শিহরিত শ্যামলতার পরপারে বেণুবনে-প্রচ্ছন্ন সাঁওতাল পল্লীটি, আব্ছা ধূমলেখা উঠছে অথবা অকালমেঘ শুভ্র ফেনায় উপ্‌চে পড়েছে দিগ্‌বলয়ের কোলে[৩]— চেয়ে দেখেছি ফাল্গুনের কোনো সোনালি বিকালবেলায় চিকন-কচি পাতায় পুলকিত অশ্বত্থ দেবদারু আর জামরুল আম নারিকেল সুপারির জটলা— কিছুই মনে হয় নি নিঃশেষিত অথবা পুরাতন-পরিচিত ব'লে। বরং মনে হয়েছে, যেখানে যা দেখছি সবই কোন্ অরূপ বা অপরূপ লোকের সীমান্তরক্ষী যেন, বক্ষে ও বাহুতে তক্‌মা-তাবিজে নানা অদৃশ্য অক্ষর— গাছ নয়, মানুষ নয়, পশু নয়— অরণ্য অথবা পর্বত, নদী অথবা সমুদ্র নয়— আমি বা তুমি নয়— সে-সবই বিচিত্র ছদ্মবেশ মাত্র। বুঝে না-বুঝে মন কেমন উদাস হয়ে গেছে।

অনির্দেশ্য বিধুর এই ঔদাস্যের অপূর্ব রূপ দেখেছি কবির '*যেতে নাহি দিব*' কবিতায়। যেতে নাহি দিব? তবু তো যেতে দিতেই হয়। সবই তবু চলে যায়।—

কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া— স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন— মুখে নাহি বাণী।

শান্ত মুখশ্রী। নিষ্পলক চাহনি। একি নন্দলালেরই শিল্পীমানসের এক নিখুঁত ছবি নয় আজ— এক অপূর্ব প্রতিমা?[৪]

৪ মার্চ ১৯৬০

*

১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

২ essential as opposed to accidental and superficial.

৩ বেলা তিনটে। মাষ্টারমশাইয়ের দক্ষিণের বারান্দা। শান্তিনিকেতনের সীমানার পরে দক্ষিণে প্রায় দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত শান্তনিথর সবুজ ধানক্ষেত— শান্ত অথচ লক্ষ লক্ষ বর্শাফলার মতো পাতায় পাতায় আর শিষে শিষে শিউরে রয়েছে। আলোকে উদ্ভাসিত। আকাশে বেকার মেঘ, তারই এক ফালি ছায়া এ দিক থেকে ও দিক পর্যন্ত সমস্ত আলোক-ক্ষেত্রটিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। ডান দিকে সাঁওতালি গ্রাম প্রচ্ছন্ন আছে দূরবর্তী বাঁশবাগানের শ্যামান্ধকারে, তার সম্মুখভূমিতে একটিমাত্র একচালা ঘর দেখা যায়— মাঠের মধ্যে দূরে দূরে বিদ্যুদ্‌বাহী তারের দু-একটা দীর্ঘাকার খুঁটি। প্রচুর আকাশ। অলস নিস্তব্ধ বেলা। পাখ-পাখালির ডাক মনোযোগ না দিলে শোনাই যায় না। আকাশে অলস ভ্রাম্যমাণ মেঘ। এই সবুজ, শ্যাম, পাণ্ডুর, ধূসর, শুভ্র* —ধানে-ভরা মাঠ, বনলেখা, একটি কুটীর, অনেকটা আকাশ— এই হল মাষ্টার-মশাইয়ের এখনকার significant ছবি, বিশেষ ছবি। প্রকৃতি। প্রকৃতির আশ্রিত জীবন কিভাবে আছে? গভীর জলের মধ্যে যেমন মাছ— একটি মাছ নয়, মাছের ঝাঁক— যেন তাদের গমনাগমনের চঞ্চলতামাত্র নেই, যেন একটিও ঢেউ উঠছে না।

—দিনলিপি। ১৬ অক্টোবর ১৯৫৯

৪ আলোচ্য চিত্রাবলীর সম্যক্‌ পরিচয় পেতে হলে সেগুলি স্বচক্ষে দেখা দরকার। ‘বড়ো কঠিন সাধনা যার বড়ো সহজ সুর’ —কথাটা প্রতিচিত্র-গ্রহণের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে সার্থক হয়েছে। সাবলীল তুলির টান-টোন, প্রতিরূপ-গ্রহণের প্রকরণগত দুরূহতায়, একটির ধার হয়ে গিয়েছে ভোঁতা আর অন্যটির ক্রমবিন্যস্ত স্তরগুলি সর্বত্র যথাযথ ফুটে ওঠে নি বা মোলায়েম হয় নি (যেখানে যেখানে তুলি আদপে কাগজ ছোঁয় নি সেখানেও একটা সূক্ষ্ম ছোপ ধরে গিয়েছে)— ফলতঃ মূলে যে টোনের লীলাবৈচিত্র্য অভিজাত ধ্রুপদ সঙ্গীতের মতো, তার মীড় মূর্ছনার বহু অপরূপতা নষ্ট হয়েছে। যেন টাট্‌কা ভাজা মুড়ির মুচ্‌মুচে ভাবটা নেই, প্রতিরূপ হয়ে পড়েছে ঈষৎ মিয়োনো মুড়ির মতো। সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলা চলে না।

জলপ্রপাত, পুঁটি মাছ, শিবগিরি বা ধবলগিরি এই ক'টি ছবির প্রতিচ্ছবি ছাপা হল। প্রবন্ধে আলোচিত অন্যান্য ছবি পূর্বে ছেপেছেন— Visva-Bharati Quarterly, Vol. 26, No. 1 এবং এ ক্ষ ণ, শারদীয়া সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ।

* রঙগুলি প্রায় সব সময় টোনে, অর্থাৎ সাদা-কালোর বিচিত্র পর্দায়, অনূদিত হয়েছে, ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

সূত্রও কিছু দূরে নয়। অর্থাৎ, দিব্য ভাবে ভাবিত কবি ও শিল্পীর নয়নে মনে নিকটই দূরের আবির্ভাবে পরমাশ্চর্যের আধার হয়ে ওঠে, পরিচিতই হয়ে ওঠে সকল পরিচয়ের অতীত। বস্তুতঃ শিল্পী নন্দলালের এই ছবিগুলি দেখার অভিজ্ঞতার পরে চেয়ে চেয়ে দেখেছি এক শরৎসন্ধ্যায় ধানক্ষেতের শান্ত শিহরিত শ্যামলতার পরপারে বেণুবনে-প্রচ্ছন্ন সাঁওতাল পল্লীটি, আব্ছা ধূমলেখা উঠছে অথবা অকালমেঘ শুভ্র ফেনায় উপ্চে পড়েছে দিগ্বলয়ের কোলে[৩]— চেয়ে দেখেছি ফাল্গুনের কোনো সোনালি বিকালবেলায় চিকন-কচি পাতায় পুলকিত অশ্বত্থ দেবদারু আর জামরুল আম নারিকেল সুপারির জটলা— কিছুই মনে হয় নি নিঃশেষিত অথবা পুরাতন-পরিচিত ব'লে। বরং মনে হয়েছে, যেখানে যা দেখছি সবই কোন্ অরূপ বা অপরূপ লোকের সীমান্তরক্ষী যেন, বক্ষে ও বাহুতে তক্‌মা-তাবিজে নানা অদৃশ্য অক্ষর— গাছ নয়, মানুষ নয়, পশু নয়— অরণ্য অথবা পর্বত, নদী অথবা সমুদ্র নয়— আমি বা তুমি নয়— সে-সবই বিচিত্র ছদ্মবেশ মাত্র। বুঝে না-বুঝে মন কেমন উদাস হয়ে গেছে।

অনির্দেশ্য বিধুর এই ঔদাস্যের অপূর্ব রূপ দেখেছি কবির 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। যেতে নাহি দিব? তবু তো যেতে দিতেই হয়। সবই তবু চলে যায়।—

কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া— স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন— মুখে নাহি বাণী।

শান্ত মুখশ্রী। নিষ্পলক চাহনি। একি নন্দলালেরই শিল্পীমানসের এক নিখুঁত ছবি নয় আজ— এক অপূর্ব প্রতিমা?[৪]

৪ মার্চ ১৯৬০

*

[১] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

[২] essential as opposed to accidental and superficial.

[৩] বেলা তিনটে। মাষ্টারমশাইয়ের দক্ষিণের বারান্দা। শান্তিনিকেতনের সীমানার পরে দক্ষিণে প্রায় দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত শান্তনিথর সবুজ ধানক্ষেত— শান্ত অথচ লক্ষ লক্ষ বর্শাফলার মতো পাতায় পাতায় আর শিষে শিষে শিউরে রয়েছে। আলোকে উদ্ভাসিত। আকাশে বেকার মেঘ, তারই এক ফালি ছায়া এ দিক থেকে ও দিক পর্যন্ত সমস্ত আলোক-ক্ষেত্রটিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। ডান দিকে সাঁওতালি গ্রাম প্রচ্ছন্ন আছে দূরবর্তী বাঁশবাগানের শ্যামান্ধকারে, তার সম্মুখভূমিতে একটিমাত্র একচালা ঘর দেখা যায়— মাঠের মধ্যে দূরে দূরে বিদ্যুদ্‌বাহী তারের দু-একটা দীর্ঘাকার খুঁটি। প্রচুর আকাশ। অলস নিস্তব্ধ বেলা। পাখ-পাখালির ডাক মনোযোগ না দিলে শোনাই যায় না। আকাশে অলস ভ্রাম্যমাণ মেঘ। এই সবুজ, শ্যাম, পাণ্ডুর, ধূসর, শুভ্র* —ধানে-ভরা মাঠ, বনলেখা, একটি কুটীর, অনেকটা আকাশ— এই হল মাষ্টার-মশাইয়ের এখনকার significant ছবি, বিশেষ ছবি। প্রকৃতি। প্রকৃতির আশ্রিত জীবন কিভাবে আছে? গভীর জলের মধ্যে যেমন মাছ— একটি মাছ নয়, মাছের ঝাঁক— যেন তাদের গমনাগমনের চঞ্চলতামাত্র নেই, যেন একটিও ঢেউ উঠছে না।

—দিনলিপি। ১৬ অক্টোবর ১৯৫৯

[৪] আলোচ্য চিত্রাবলীর সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে সেগুলি স্বচক্ষে দেখা দরকার। ‘বড়ো কঠিন সাধনা যার বড়ো সহজ সুর’ —কথাটা প্রতিচিত্র-গ্রহণের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে সার্থক হয়েছে। সাবলীল তূলির টান-টোন, প্রতিরূপ-গ্রহণের প্রকরণগত দুরূহতায়, একটির ধার হয়ে গিয়েছে ভোঁতা আর অন্যটির ক্রমবিন্যস্ত স্তরগুলি সর্বত্র যথাযথ ফুটে ওঠে নি বা মোলায়েম হয় নি (যেখানে যেখানে তূলি আদপে কাগজ ছোঁয় নি সেখানেও একটা সূক্ষ্ম ছোপ ধরে গিয়েছে)— ফলতঃ মূলে যে টোনের লীলাবৈচিত্র্য অভিজাত ধ্রুপদ সঙ্গীতের মতো, তার মীড় মূর্ছনার বহু অপরূপতা নষ্ট হয়েছে। যেন টাট্‌কা ভাজা মুড়ির মুচ্‌মুচে ভাবটা নেই, প্রতিরূপ হয়ে পড়েছে ঈষৎ মিয়োনো মুড়ির মতো। সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলা চলে না।

জলপ্রপাত, পুঁটি মাছ, শিবগিরি বা ধবলগিরি এই ক’টি ছবির প্রতিচ্ছবি ছাপা হল। প্রবন্ধে আলোচিত অন্যান্য ছবি পূর্বে ছেপেছেন— Visva-Bharati Quarterly, Vol. 26, No. 1 এবং এ ক্ষ ণ, শারদীয়া সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ।

* রঙগুলি প্রায় সব সময় টোনে, অর্থাৎ সাদা-কালোর বিচিত্র পর্দায়, অনুদিত হয়েছে, ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

নূতন তাৎপর্য

পূজনীয় নন্দলালের সাম্প্রতিক কালীতুলির ছবিতে ধ্রুপদ গানের মতো গাম্ভীর্য আছে, গভীরতা আছে, দূরগামিতা আছে, 'সুরে দাঁড়ানো' আছে। খেয়াল টপ্পা ঠুংরির লীলাবিলাস, চটুলতা, অধীরতা, আবেগ ও আবেশের আতিশয্য, কিম্বা নাটকীয়তা নেই। লোক-দেখানো ভাবভঙ্গী কায়দা-কসরৎ বা চাতুরী নেই। শান্ত, স্থির, আত্মবিস্মৃত ও আত্মস্থ ভাব। এটি হয়েছে অনায়াসে, স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাবে।

এত অল্প আয়াসে ও অল্প উপকরণে এতখানি রূপের প্রকাশ, ভাবের ব্যঞ্জনা এবং রসের উদ্রেক, যে-কোনো রূপরসিককেই বিস্মিত পুলকিত করবে। এ যুগে এই একটি অপ্রত্যাশিত বিরল ঘটনা।

ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে পল্লীবালা, গোরুর গাড়িতে যাচ্ছে গ্রাম্যপরিবার, শালবনের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা, রাত্রে মাঠের মধ্যে আলেয়ার অস্থির দীপ্তি, প্রদীপ জ্বলছে ঘাটে-বাঁধা নৌকোয় যেন কোন্ রহস্যের অন্তর্লোকে —এ-সবই ঘটছে অনন্ত দেশে ও কালে, যেখানে কোনো ত্বরা নেই, সূচনা নেই, শেষ নেই।

মাঠ-ভরা ধান কাটা হচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় উথল-পাথাল সমুদ্র। অপূর্ব বিস্তার। খদ্যোতে অথবা ঘাসফুলে-ফুলে তারকার দ্যোতনা মনে এনে দিলে যে বিস্ময়, ঠিক তেমনি। বিস্তার কিরূপ? যা দেখে 'আঁখিপাখি ধায়' ওড়বার সুখে।

একটি চালাঘরের খোলা দরোজায় কলস-কাঁখে একা পল্লীবধূ, পিছন দিকে কয়েকটি আমগাছের পল্লবপুঞ্জিত শ্যামঘন অবয়ব-- চিত্রক্ষেত্রের অভ্যন্তরে এই অল্প কয়টি রূপের আরোপ অনেকটাই মধ্যখানে, যেটা শিল্প-শাস্ত্রের বিধানে নিন্দনীয়ই শুনতে পাই— অথচ বিমুগ্ধ দর্শকের মনের নয়নে জেগে উঠেছে নিভৃত, বনচ্ছায়াবেষ্টিত, বিহঙ্গকূজিত, অনাড়ম্বর এক পল্লী-পরিবেশে দিনান্তবেলার সমুদয় শান্তি ও সুখ। কাকচক্ষু জল কানায় কানায় টল্‌টল্ করছে, কুমুদ-কহ্লারে পাড় আঁকা রয়েছে, সেই কালীদীঘিটি

চোখে দেখা না গেলেও মনের অগোচর নেই, আর এ কথাও ভুলেছে মন এই শান্তির-নীড় শোভন গ্রামটিতে পৌঁছুতে হলে আজ থেকে তিন-চার শো বছর পিছনে যেতে হবে। এ কাল থেকে সে কালে যাবার সেই পথ শিল্পী কেবল চিনে নিয়েছেন, আর কেউই বুঝি জানে না।

কলিকাতায় ১৯৬০ সেপ্টেম্বরে, গড়ের মাঠের পূর্বদক্ষিণপ্রান্তে বড়ো গির্জের প্রতিবেশে, শিল্পীর এখনকার পঞ্চাশখানি মাত্র ছবির যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তারই যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতি বিধৃত হয়ে রয়েছে পূর্ববর্তী লেখায়। এ কথাও মনে পড়ে বাঁশতলা তুলোপটি টেরিটিবাজার চীনেমহল্লা চৌরঙ্গীঅঞ্চল পার হয়ে, যন্ত্রযানের শ্বাসরোধী ভিড়ে ও ঝাঁকুনিতে প্রাণ ও পকেট সাবধানে সাম্‌লে, একদিন শরৎসন্ধ্যায় 'প্রদর্শনীর দ্বারে যখনই পৌঁছেচি, চৌকাঠও পার হয়ে গেছি, নিমেষেই কেমন ক'রে উত্তীর্ণ হলেম চেনা জগৎ-সংসার ছেড়ে চিরঅচেনা এক ভুবনে। প্রতিদিনের অন্তরে লুকোনো কী-এক চিরদিন! শহর-জীবনে তাড়িত উৎপীড়িত মনে পড়ে কোনো কবির বেদনার্ত, প্রায় স্বগত, করুণ উক্তি— ব্যবহৃত! ব্যবহৃত! ব্যবহৃত! সিদ্ধ-শিল্পীর প্রসাদে চোখ চাইতেই দেখে বাঁচলাম— সকল ব্যবহারের অন্তরে এবং ঊর্ধ্বে দীপ্যমান, মানবমনেরই আবিষ্কৃত অথবা সৃষ্ট, এই যা-কিছু রূপের অপূর্ব এক রূপান্তর। তাকে রসরূপ বলতে পারি আর অবচ্ছিন্ন রূপায়ণ বললেও একেবারে ভুল বলা হবে না।

কেননা, দেশে বিদেশে রূপকলাঅনুশীলনে আজ যে সংকটসংকুল ক্রান্তি দেখা দিয়েছে, তারই সকল দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতা অতিক্রম ক'রে একটি কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডায় আর অনেক ভারী ভারী বই প'ড়েও এপ্রকার নিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া নাহলে আমাদের অসাধ্যই ছিল।—

অবচ্ছিন্ন বা অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ আর্টের প্রসঙ্গ আজ সর্বত্র শোনা যায়, নিখিল আর্টের সেই যেন শেষ লক্ষ্য। অথচ বস্তুটি কী? 'সোনার পাথর-বাটি' ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবার দিন চলে গেছে আর উপযোগিতাও নেই। দেশে দেশান্তরে যে লক্ষ্যে প্রাণপণ করছেন মনে হয় আজকের বহু শিল্পী,

বহু রূপরসিক, একটা কোনো তাৎপর্য তার আছেই— সেটির সন্ধান পাব কোন্‌খানে ?

অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ বা অবচ্ছিন্ন বলতে নিরাকার অবশ্যই নয়, নিরাধার নয়, যেহেতু চোখে তা হলে দেখাই যায় না। আমাদের পূর্বপরিচিত বিশেষ আকার, পূর্বস্মৃত পূর্বানুভূত বিশেষ অনুষঙ্গ, এর থেকে উত্তরোত্তর যে দূরাভিসার, বোধ করি তাকেই বলতে পারি 'বিমূর্ত' রূপকলা, 'অবচ্ছিন্ন' মূর্তি বা চিত্র। সমুদয় রূপ-রেখা-রঙ আকার-অবয়ব-গড়ন এবং অনুষঙ্গের বন্ধন ছিন্ন ক'রে একেবারে অরূপে প্রয়াণ আর্ট্‌ নয় যে, এ তো জন্মান্ধ ব্যতীত সকলেই বোঝে— অন্ধের কাছেই আর্ট্‌ হল অর্থহীন একটি শব্দ মাত্র।

রূপ এবং অরূপের প্রসঙ্গ নাহয় থাক্‌, বরং বলা যাক্‌— রূপ এবং গুণ, বস্তু এবং ভাব। যে-কোনো আর্টের আছে এই উভয় কোটি। ধনুকে যেভাবে ছিলা পরানো হয় তেমনি ক'রেই রূপ এবং গুণ, বস্তু এবং ভাব, যুগপৎ আকর্ষণ ক'রে দর্শকের অন্তঃকরণকে তীরের মতো রসের লক্ষ্যে প্রেরণ করাই আর্টের বিশেষ উদ্দেশ্য।

না। সুন্দর উপমার দোষ এই যে, অনেক সময়েই সে আমাদের সুন্দরভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। অতএব দুই কোটি কিম্বা আকৃষ্ট ধনুঃশরের উপমা বোধ করি ভুলে যাওয়াই ভালো। বোধবান্‌ বুদ্ধিমান্‌ মানুষের কাছে একই কালে রূপ এবং গুণ, বস্তু এবং ভাব, উভয়কে জড়িয়েই বিশ্বসংসারের যা-কিছু আছে। দার্শনিকেরা এমনও বলতে পারেন— বস্তুটি নানা গুণের সমষ্টিমাত্র, অন্যকিছু নয়। মানবমনের থেকে ভাবটুকু বাদ দিলে সব-কিছুরই অভাব হয়ে পড়ে। অথচ বিশেষ ঝোঁক বা বিশেষ অভিনিবেশ থাকা সম্ভব রূপের দিকে যেমন, তেমনি গুণেরও দিকে। বস্তু বা বস্তুর রূপকেই একান্ত ক'রে ধরলে বস্তুর গুণ বা ভাব যতটুকু পাওয়া যায়, সে তার লক্ষণ মাত্র, সে এক প্রকার উপরিপাওনা শুধু। অপর পক্ষে গুণকেই একাগ্র লক্ষ্য ক'রে, তন্ময়চিত্তে ধ্যান ক'রে, শিল্পী যে চিত্র বা মূর্তি রচনা করবেন, বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপ সেখানে শিল্পী ও রসিকের মনোগত ভাবের অবতরণের জন্যই আছে, যতটুকু থাকা প্রয়োজন, যতটুকু না থাকলে নয়। সে কদাচ বলে না 'আমায় দেখো', ইঙ্গিতে ইশারায় সে শুধু দেখিয়ে দেয়

অতীন্দ্রিয়কে, যা চোখে দেখবার নয়— প্রায় অব্যবহিতভাবে আর নিমেষ-মাত্রেই জাগিয়ে দেয় রসের অনুভূতি। বস্তুঅনুকারী আর বস্তু-ঘেঁষা আর্টের থেকে আত্মবিস্মৃত অবস্তুক আর্টের অভিমুখে শিল্পী বা রসিকের প্রয়াণ এই ভাবেই সিদ্ধ হয়।

এ ব্যাখ্যা শিল্পী নন্দলালের। তিনি বলেন— অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ আর্টের সন্ধানে মন্‌ড্রিয়ান (Mondriaan), সেজান (Cézanne), পিকাসো (Picasso), ব্রাঁকুশি (Brancusi), বা গাবো (Gabo), এঁদের দ্বারস্থ না হয়ে আমরা তো অতীত দিনের প্রাচ্যে, ভারতে বা চীনেও যেতে পারি। বুদ্ধ অথবা নটরাজ মূর্তি কিম্বা পাঁচটি পার্শিমন ফলের ছবিটি স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধমূর্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি নয়। পরন্তু, বুদ্ধ যে ভাবের অবতার, সেই বিশ্বভুবনব্যাপী মৈত্রী করুণা ও নির্বিচল শান্তিরই রূপ। ব্যক্তিমানব ছিলেন সিদ্ধার্থ, কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদনতনয়, আর বুদ্ধ হলেন বিশ্বমানব— বিশেষকে ছুঁয়ে কি না-ছুঁয়ে একটি বিশ্বভাবের উদয়। ভাবই রূপ পেয়েছে, রূপ থেকে ভাব জেগে ওঠে নি— অতীতের উৎকৃষ্ট বুদ্ধমূর্তিনিচয়ে এইটেই বিশেষভাবে দর্শনীয়।

নটরাজ তেমনি বিশ্বছন্দই সাকার। রূপ থাকলেও, ভাবের মধ্যে আবৃত, নিমজ্জিত, সংবৃত ও সংহত— উপরন্তু গতিশীল।

পার্শিমন-পঞ্চক তেমনি রূপরসিক দর্শকের ধ্যানতন্ময়তার অবলম্বন মাত্র, কোনো বস্তুপরিচয়ের অভিজ্ঞান নয়। উচ্চকোটির লেখাঙ্কনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য— একটু টান-টোনের বাঁটোয়ারা, ছাপ-ছোপের বাহার, একখানি পটের নিরবচ্ছিন্ন আকাশটিকে ন্যূনতম প্রযত্নে বিভক্ত ক'রে দিয়ে মনোগোচর ক'রে ধরা, মানসআকাশের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক ক'রে দেওয়া।

এমনও বলতে পারি— এক দিকে বস্তুসাদৃশ্য তথা রূপসাদৃশ্যের সন্ধান, অন্য দিকে ভাবসাদৃশ্যের উদ্‌বোধ, আর্টের এই হল দুটি শেষ সীমা। এক দিকে জাগে বস্তুর বাস্তবতা, দেহ। অন্য দিকে, বস্তু ভুলে, রূপ ছুঁয়ে, চকিতে মন উধাও হয়েছে বিমূর্ত প্রাণ, ছন্দ, ভাব, সুষমা ও রসের অভিমুখে।

অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ আর্টের সন্ধান তাই একেবারে অর্থহীন কিম্বা অসংগত নয়। হয়তো অনিবার্যও বলা যেতে পারে।

অথচ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, অতীতে ও বর্তমানে, বিভিন্ন শিল্পীসমাজে বিমূর্ত রূপকলার অভিসারে একটি বিশেষ পার্থক্যও আছে। এজন্যই বোধ করি বিমূর্ততাউন্মুখ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য রূপকলাকে একই অভিধানে অভিহিত করাও চলে না।

প্রতীচ্য মূর্তিকার চিত্রকার স্বভাবতই ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, প্রাণের সকল আবেগ ও আবেশ দিয়ে, বাস্তব রূপের ভুবনেই মশগুল, অভিনিবিষ্ট ছিলেন। বিমূর্ততার প্রতি আকর্ষণ তাঁর সহজাত স্বাভাবিক বলা যায় না— বহু শতাব্দ ধ'রে বহির্মুখ মন নিয়ে,ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনোমোহকর, বহির্জগৎ ও বহির্জীবনকেই নিরতিশয় আসক্তভাবে ভোগ করার প্রতিক্রিয়া-বিশেষ। কেননা, মাত্রাতিরিক্ত হলে ভোগ মাত্রই আনে অতৃপ্তি, অরুচি ও অবসাদ— ঘৃণা বা জুগুপ্সা, সেটাই যে প্রকৃত বৈরাগ্য এমন নয়। প্রতীচ্য মানস আজও তাই এক দিকে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে ভোগের অজস্র উপকরণ উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছে, গ্রহে গ্রহান্তরে আধিপত্যবিস্তারে উদ্যত হয়েছে, আর-এক দিকে তার মায়ামুগ্ধ অথচ অতৃপ্ত আত্মা কেবলই বলতে চাইছে— 'এ নহে, এ নহে, নয় গো!' এই প্রতিক্রিয়ারই অন্যতম ফল হল সাহিত্যে ও প্রায় সকল প্রকার রূপকলায় নানা নূতন পথের সন্ধান, ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, কদাচিৎ হয়তো বা উন্মত্ততা।

মনোবুদ্ধি সহায় ক'রেই প্রতীচ্য সেই জিনিষের সন্ধান করতে চান— বুদ্ধিবিচারে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ল্যাবরেটরিতে ও মনঃসমীক্ষাগারে যা কখনো পাওয়া যায় না।

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রাচ্য খুঁজেছে, বুঝেছে, লাভ করেছে অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ ও আনন্দ আপনার সামগ্রিক সত্তা দিয়ে, স্বভাব দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। বুদ্ধি দিয়ে নয়, বিচার বিতর্ক দিয়ে নয়। এরই সুস্পষ্ট ছাপ তার জীবনে, ভাবনাভঙ্গীতে, আচার-আচরণে, তেমনি সাহিত্যে ও রূপকলায়। হৃদ্‌বোধের দ্বারা, ধ্যানতন্ময়তার গুণে, প্রাচ্য এই রূপের জগতেই পেয়েছে সেই অরূপ অপরূপকে, প্রকাশ করেছে শিল্পে, যা অতর্কণীয়, যা আবির্ভূত মাত্র। রূপ থেকে এই অপরূপকে সহসা পৃথক্‌ করাও যায় না, পৃথক্‌ ব'লে চেনাও যায় না— এতই সহজ স্বাভাবিক এর প্রকাশ।

পাশ্চাত্যে বিমূর্ততার অভিসার ঠিক তেমনটি নয়। হৃদ্‌বোধের দ্বারা প্রেরিত আর হৃদয়সংবেদ্য নয় ব'লেই উৎকট চেষ্টার লক্ষণ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। মুখ্যতই বুদ্ধিগ্রাহ্য ও বুদ্ধিপ্রেরিত কোনোপ্রকার পরীক্ষা অথবা প্রয়োগের ফলে, স্থায়ী তৃপ্তি ও বিরতির উদয় হতে পারে না। পরীক্ষার পর পরীক্ষাই চলে, পৌঁছনোর খবর মেলে না। মানুষের শিল্পে, সাহিত্যে, জীবনে, শেষ পৌঁছনোর বার্তা না থাকলেও (সেটি হলে তো সবই শেষ হয়ে যায়) পদে পদে পৌঁছনোর একটি ভাব অথবা ভঙ্গী অবশ্যই আছে। তাই কবি বলতে পারেন : পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

রূপের দেউলেই অরূপ অতীন্দ্রিয়ের সেই পূজা নন্দলালের শিল্পীজীবনে আজও অবিরত, আজও নিত্য নবভাবে অনুষ্ঠিত, আজ একটি অপূর্ব সীমান্তে উপনীত— নন্দলালের নিরাভরণ নিরাবরণ এখনকার ছবিগুলি তারই সুস্মিত সাক্ষ্য সর্বাবয়বে বহন ক'রে সুন্দর হয়ে উঠেছে।[১]

জোড়াসাঁকো
৮ অক্টোবর ১৯৬২

প্রাসঙ্গিক
উদ্‌ধৃতি

ছোটো ছেলের আঁকা ছবিও খুব সুন্দর হয় ; আশ্চর্য ছন্দ আশ্চর্য রঙ তাতে থাকে। তবুও ছোটো ছেলের কাজের নকল ক'রে আর্টিষ্ট্‌ হওয়া যায় না। ছোটো ছেলের কাজের গুণ [রঙ বা রেখা নয়— ছন্দ] বড়ো আর্টিষ্টের কাজে আসে, যখন তিনি 'জ্ঞানে'র চরমে পৌঁছোন। কারণ, বড়ো মানুষ ছোটো ছেলের অনুকরণ করলে হয় ন্যাকামি, অথচ বড়ো মানুষও ছোটো ছেলে হয়ে থাকেন জানি— তাঁকেই আমরা বলি প্রতিভাবান্‌ বা পরমহংস।

— আচার্য নন্দলালের উক্তি। শিল্পকথা

১ আমরা এ পর্যন্ত যে ছবিগুলির আলোচনা করেছি তার পরেও শিল্পীর তূলি বিরত হয় নি। শিল্পী উত্তরকালে এমন অনেক ছবি এঁকেছেন যেখানে তাঁর রূপতন্ময়তা কালীতূলির প্রায়-নির্বস্তুক কয়েকটি ছাপ-ছোপে এবং দিগন্তের বা পাহাড়ের একটি রেখার একটু ভাবলাবণ্যে ও **সংকেতে** পর্যবসিত। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার এখনও সময় বা সুযোগ আসে নি। 'অবচ্ছিন্নতা' বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্পর্কে পুরাতন দিনলিপি থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া অসংগত হবে কি? হয়তো বলবার কথাটা সোজাসুজি প্রকাশ পেয়েছে।—

What is abstraction in art? You may call it 'a new kind of objectivity' where the object is on the verge of losing its identity —'each' being submerged in 'All'.

It is not an imposition of the artist's own self on the object.

Neither it is objective nor subjective.

Having mastered one's object thoroughly one may represent it simply and powerfully by some symbol, some suggestion. The object is present there in its essential character and quality— no accidental details, no distraction. The object is not the ultimate goal of the artist's quest though necessary.

Here you find a kind of purposeful abstraction inspired and inwardly felt by the heart. It has got some positive meaning and message too.

Abstraction or abstract quality apprehended by the head is something quite different— art or no art— and it is typically European.

22.9.60

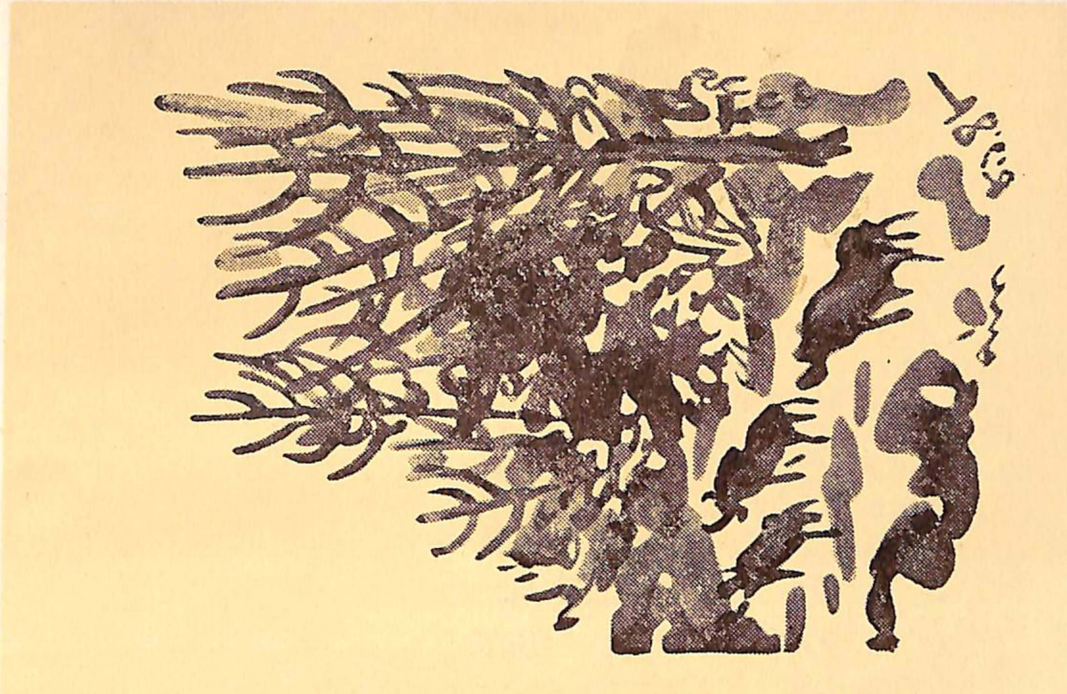

"Now I am old and infirm. I fear I shall no more be able to roam among the beautiful mountains! Clarifying my mind, I meditate on the mountain trails and wander about only in dreams." Tsung Ping

শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত

মুখ্যচিত্র-পঞ্জী

বর্তমান চিত্রপঞ্জী-প্রণয়নে World Window (April-June 1961) পত্রে সংকলিত চিত্রতালিকা থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেছে। ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীর বার্ষিক প্রদর্শনীগুলির চিত্র-তালিকা দেখার সুযোগ আমাদের হয় নি; খৃষ্টীয় ১৯৫৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ মার্চ্-এপ্রিল ও ১৯৫৮ সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে বোম্বাই শহরে, কলিকাতার শিল্পমহাবিদ্যালয়ে ও পার্ক্ স্ট্রীট আর্টিষ্ট্রি-হাউসে যে চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রদর্শনী বিশেষভাবে শ্রীনন্দলাল বসুরই চিত্রপ্রদর্শনী ছিল) সেগুলির চিত্রতালিকা থেকে সাহায্য লওয়া হয়েছে। ত্রুটি বিচ্যুতির অবকাশ যথেষ্ট আছে। নির্ভুল নিখুঁত ও 'সম্পূর্ণ' (?) তালিকা-প্রণয়ন বহুজনের বহু যত্ন এবং পরিশ্রম -সাপেক্ষ। কোনো কোনো চিত্রের উল্লেখের পর তার আয়তন নির্দেশ করা হয়েছে ইঞ্চের মাপে; ৭·৫ = সাড়ে সাত ইঞ্চ্। কদাচিৎ যথোচিত চিহ্ন দিয়ে, ফুটে ॥

বিশেষ সংকেত— [০]ওয়াশ ও টেম্পারার মিশ্র রীতির ছবি, [১]রেখাচিত্র, [২]লিপ্ত বা টেম্পারা, [৩]লিথো, [৪]কাঠ-খোদাই-জাতীয় কাজ, [৫]চীনা কালীতুলি -যোগে ছাপছোপের ছবি, [৬]রঙে ছাপছোপের ছবি, [৭]এচিং, [৮]ড্রাইপয়েন্ট্। চিহ্নবিহীন ছবি প্রধানতঃ ওয়াশ বা অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত ধোওয়াট রীতিতে আঁকা ॥

একই বিষয় বা মূল বিষয় দুবার দুরকম পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকলে কখনো বা একই ক্রমিকসংখ্যার পরে একাধিক চিহ্নেও বলা হয়েছে। যেমন— ১৬২ [৩]মন্দিরানৃত্য[৫]। ফলতঃ দুটি চিত্রকৃতি লিথোতে ও কালীতে; নটীর রূপায়ণে ভিন্নতা না ঘটলেও, আকার এবং পশ্চাৎপট ভিন্ন ॥

অনবধানহেতু কোনো কোনো চিত্রের উল্লেখ যথাস্থানে বা যথোচিত ক্রমে হয়ে ওঠে নি; এজন্যই আবার ৮৬।১, ৮৬।২ অথবা ১৯২।১, ১৯২।২, ১৯২।৩ এরূপ 'সংখ্যা'-গুলির উদ্ভব। মনে হয় এ-সকল ক্ষেত্রে অনুল্লেখের তুলনায় যে কোনোরূপে উল্লেখ থাকাই ভালো ॥

১ মহাশ্বেতা (কলিকাতায় আর্ট্ স্কুলে প্রবেশের পূর্বে আঁকা ছবি)

॥ ১৯০৬-১৯১৮ ॥

২ সিদ্ধার্থ - শরাহত হংস। ৩ কর্ণের সূর্যবন্দনা ৮ × ৯। ৪ গরুড়স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য ১৫·৫ × ৯। ৫ নকল বুঁদি ১০ × ৭·৫। ৬ কৈকেয়ী। ৭ সতীদেহ-ক্রোড়ে শিব

১৯·৫ × ৬·৫। ৮ নৌকাবিহার ২১ × ১৫। ৯ যম-সাবিত্রী। ১০ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ১১ দময়ন্তীস্বয়ংবর। ১২ তীর্থযাত্রী। ১৩ গান্ধারী। ১৪ পদ্মিনী-ভীমসিংহ। ১৫ শিবতাণ্ডব। ১৬ হাতে-খড়ি। ১৭ চৈতন্য। ১৮ আরব্যাখ্যান। ১৯ জতুগৃহদাহ। ২০ অন্নপূর্ণা। ২১ অহল্যাউদ্ধার। ২২ দশরথের মৃত্যু। ২৩ সতী ১২ × ৭·৫। ২৪ সুজাতা। ২৫ অগ্নি। ২৬ বেতালপঞ্চবিংশতি। ২৭ কালীদীঘির পাড়ে ইন্দিরা। ২৮ একলব্য। ২৯ দ্রোণের শরশিক্ষাদান। ৩০ হরিশ্চন্দ্র। ৩১ ষষ্ঠীপূজা। ৩২ ঘাটের পথে। ৩৩ ডাকহরকরা। ৩৪ পৌষপার্বণ†। ৩৫ জীবন-মৃত্যু। ৩৬ তালপাতার বাঁশি। ৩৭-৬৩ রামায়ণ-পট[২]*। ৬৪ কাবুলিওয়ালা[১]। ৬৫ কৃষক[১]। ৬৬ ক্রীড়া[১]। ৬৭ পার্থসারথি ৩১ × ২১। ৬৮ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ৬৯ গোকুলব্রত। ৭০ উমার শীতকালীন তপস্যা†। ৭১ কীরাতার্জুন। ৭২ গরুড়। ৭৩ জন্মাষ্টমী। ৭৪ শিবের বিষপান। ৭৫ যম-নচিকেতা। ৭৬ মন্ত্রী শকটার। ৭৭ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান। ৭৮ ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়। ৭৯ কলিকাতার রাস্তায়[১]। ৮০ জগাই-মাধাই[১]। ৮১ বুদ্ধ ও মেষশাবক। ৮২ কাশীর ঘাটে। ৮৩ শ্রীরামপাদুকা-পূজা। ৮৪ শীতের পদ্মায় ৩৬ × ১৫·৫। ৮৫ মীরাবাঈ[১]। ৮৬।১ ঝড়বৃষ্টিতে কোনারক ৬০ × ২৬। ৮৬।২ কোণার্কমন্দির[৩]। ৮৭ বধূ-প্রসাধন। ৮৮ কৃষ্ণার্জুন। ৮৯ নিমাইয়ের জন্ম। ৯০ তাঁতী। ৯১ পথহারা গাভী ১৮ × ৮। ৯২ জাল। ৯৩ আশ্রম। ৯৪ রাখালি। ৯৫ শরৎ। ৯৬ নটী। ৯৭ জ্ঞান ও

---

* আহমদাবাদে কস্তুরভাই লালভাই -সংগ্রহে ২৭ খানি ছবি আছে, 'অহল্যাউদ্ধার' সেগুলির অন্যতম। World Window পত্রের তালিকা-অনুযায়ী আলোচ্য রামায়ণ-পটের সংখ্যা ২৬, তা ছাড়া বিশদভাবে আর কিছু জানা যায় না। [উক্ত তালিকায় পটচিত্রমালা-বহির্ভূত 'অহল্যাউদ্ধার' ও 'অহল্যা' দুখানি চিত্রের উল্লেখ আছে ১৯১০ ও ১৯১৩ সালের চিত্রগুচ্ছে। আমরা পৃথক্‌ভাবে অহল্যাউদ্ধারের উল্লেখ একবারই করলাম, এটি ১৯১০ সালে আঁকা এবং রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর -সংগ্রহে আছে।]

এ কথা উল্লেখযোগ্য : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়- সম্পাদিত ও প্রকাশিত কৃত্তিবাস-রামায়ণে অনেকগুলি রামায়ণ-পটই দেখা যাবে এবং সে ক্ষেত্রে অহল্যার যে ছবি আছে তা প্রফুল্লনাথ-সংগ্রহের চিত্র থেকে পৃথক্‌।

† প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাহাজডুবিতে নষ্ট হয়। প্রথমোক্ত চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি 'প্রবাসী 'পত্রে মুদ্রিত; দ্বিতীয় চিত্র ছাপা হয় নিবেদিতা ও কুমারস্বামীর Myths of the Hindus & Buddhists গ্রন্থে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে।

কল্পনা (বসু-বিজ্ঞানমন্দির)। ৯৮-১০৩ বিজ্ঞানমন্দিরে মহাভারতের চিত্র। ১০৪ স্নানান্তে। ১০৫।১ 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'[১]। ১০৫।২ পথিক[১]। ১০৫।৩ কুমারসম্ভব। ১০৫।৪ পৃথিবী। ১০৬ সমুদ্র। ১০৭ শরৎশ্রী (বড়ো ছবি)[২]। ১০৮ সাঁওতালি নৃত্য[৩]। ১০৯ হরিণ[১]। ১১০ হাতী[১]। ১১১ ঘোড়া[১]। ১১২ 'ঝরচে জগৎ ঝর্ণাধারার মতো'[২]। ১১৩ The Home। ১১৪-১২৬ Gitanjali & Fruit-Gatheringএর ছবি*। ১২৭।১ হরগৌরী

॥ ১৯১৯-১৯২৭ ॥

১২৭।২ সাঁওতাল রমণী ৫১×২৬·৫। ১২৮ হাট-ফেরত। ১২৯ ঘাসফুল। ১৩০ সাথি। ১৩১ আল্পনা। ১৩২ দিনের বিদায়। ১৩৩ রন্ধনরতা। ১৩৪ খেলার বেলা। ১৩৫ পল্লী-বালা। ১৩৬ শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা। ১৩৭ হংসপংক্তি। ১৩৮-৪০ শবরীর প্রতীক্ষা। ১৪১ গুরুদেব। ১৪২ হরিণশিশু। ১৪৩ দুপুরের কাজ। ১৪৪ গজউদ্ধার। ১৪৫ কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী। ১৪৬ কালিকা। ১৪৭ বসন্তোদয়। ১৪৮ উমার তপস্যা ৫৪×৩০। ১৪৯ রাত্রে বোলপুর-পথ। ১৫০ উমার ব্যথা[২] ৫৩×২১। ১৫১ 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। ১৫২ বর্ষামঙ্গল[২]। ১৫৩ মাটি কাটা[২] ৪৬×১৪। ১৫৪ কৃষ্ণার্জুন। ১৫৫ মধ্যাহ্নপ্রতীক্ষা। ১৫৬ [১]বীণা-বাদিনী[২]। ১৫৭ প্রতীক্ষা[২]। ১৫৮ পেঁচা[২]। ১৫৯ কুয়োতলায় স্নান[১]। ১৬০ ঝড়ের রাত্রি। ১৬১ জবা[২]। ১৬২ [৩]মন্দিরানৃত্য[৬]। ১৬৩ জলসত্র। ১৬৪ পশারিনী। ১৬৫ পোয়ে নাচ[২] ৪২×২৭। ১৬৬ কৃষ্ণচূড়া[২]। ১৬৭ মেষশাবক ক্রোড়ে বুদ্ধ[১]। ১৬৮ শ্রমণ-সেবারত বুদ্ধ[১]। ১৬৯ শান্তিনিকেতন-দিক্‌সীমা ২৬·৫×২·৮। ১৭০ আশ্রমহৃদি। ১৭১ অন্যমনা। ১৭২ শিবপূজা। ১৭৩ রাতের পাহারা। ১৭৪ অর্জুনের তপস্যা। ১৭৫ গিরিচূড়া। ১৭৬ মৃগযূথ। ১৭৭ কুরুক্ষেত্র[২]। ১৭৮ পুরোনো বাড়ি[৭]। ১৭৯ দুর্গা[১]। ১৮০ উত্তরা। ১৮১ স্বপ্নের ভুল। ১৮২ সাঁওতাল মা। ১৮৩ [২]কুণাল-কাঞ্চনমালা[২]। ১৮৪ মোরগ[২]। ১৮৫ সপ্তমাতৃকা[২]। ১৮৬ গুরু অবনীন্দ্রনাথ[২]। ১৮৭ গঙ্গাযমুনা[১]। ১৮৮ সঙ্ঘমিত্রা[১]। ১৮৯ পুঁথিলিখনরত শ্রীগৌরাঙ্গ[১]। ১৯০ কেঁদুলি-মেলা[১]। ১৯১ নটীর পূজা[০] ৬৩×৩৪। ১৯২।১ ধূমাবতী। ১৯২।২ বর্ষফল-কথন[২]। ১৯২।৩ শ্যামাঙ্গিনী তারা[২]। ১৯৩ দেওদার[৫]। ১৯৪ শালবৃক্ষঅন্তরালে বুদ্ধ[৫]। ১৯৫ শ্রীচৈতন্য[১]। ১৯৬ প্রত্যাবর্তন[১] ৮১×৪৭·৫

---

* পূর্ববর্তী ৩৩, ৬৪, ১০৫।১, এবং উপস্থিত ১১২-১২৬, সবগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের চিত্র-ভাষ্য। সচিত্র Gitanjali & Fruit-Gatheringএর প্রথম প্রকাশ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ; মুখপাতে 'বাউল' এবং শেষে 'বিপুল-তরঙ্গ রে' রঙে ছাপা হয়।

॥ ১৯২৮-১৯৩৭ ॥

১৯৭ নেপালী মূর্তিকার। ১৯৮ ঝড়। ১৯৯ বৃহন্নলা[০] ৫´×২·৫´। ২০০ দীনবন্ধু এন্ড্রুজ। ২০১ গোপিনী। ২০২ হলকর্ষণোৎসব[৬] (শ্রীনিকেতন ফ্রেস্কো) ৪৭´×৩·৫´। ২০৩ বরযাত্রা পট[২]। ২০৪ কৃষ্ণচূড়া[৬]। ২০৫ বৃক্ষরোপণ[৪]। ২০৬ কাঞ্চনজঙ্ঘা-যোগমূর্তি। ২০৭ গুরুপল্লী। ২০৮ শাল ও বনপুলক[২]। ২০৯ নয়নতারা ফুল[২]। ২১০ জানালা[২]। ২১১ খেলা[৬]। ২১২ লৌকিক আখ্যান[৬]। ২১৩-২২৪ কার্শিয়ঙ-দৃশ্যচিত্রাবলী[৫]। ২২৫ নটীর পূজা[১]। ২২৬ শ্রীগৌরাঙ্গের টোল[১]। ২২৭ তরুঅন্তরালে[৪]। ২২৮ [৪]ডাণ্ডী-অভিযান[২]। ২২৯ কুরুপাণ্ডবের দ্যূতক্রীড়া[২]। ২৩০ দুর্গা[১†] ৩০·৫×১৯। ২৩১ কালী[২]। ২৩২ গ্রীষ্ম[৬]। ২৩৩ বসন্ত[৬]। ২৩৪ সন্ধ্যা[৬]। ২৩৫ রাত্রি[৬]। ২৩৬ বাতায়নবর্তিনী[৬]। ২৩৭ পাখি-ধরা[৪]। ২৩৮ শ্রীচৈতন্যের জন্ম। ২৩৯ বনশ্রী[৬]। ২৪০ মহিষাসুরমর্দিনী[১†] ৩১×২৬। ২৪১ কালী[১]। ২৪২-২৪৯ জয়পুর-প্রচলিত রীতিতে শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাগারের ভিত্তিচিত্রাবলী। ২৫০ জন্মাষ্টমী[৬]। ২৫১ আরাধনা। ২৫২ অলিন্দবর্তিনী[২]। ২৫৩ গঙ্গা[৫]। ২৫৪ সক্ড়িগলি ঘাট[৫]। ২৫৫ গঙ্গায় নৌকা[৫]। ২৫৬ কহলগাঁওয়ে গঙ্গায়[৫]। ২৫৭ যাত্রী। ২৫৮ চৈতন্যের গৃহত্যাগ। ২৫৯ দেবদাসী[২]। ২৬০ শান্তিনিকেতন-'চৈত্য'[২]। ২৬১ রান্নাঘরের সামনে[৬]। ২৬২ বোলপুরের রাস্তা[৬]। ২৬৩ নীচুবাংলা[৬]। ২৬৪ যাত্রী[৬]। ২৬৫ তারকিত রাত্রি[৬]। ২৬৬ চীনের খেলনা[১]। ২৬৭ কাণ্ডীয় নৃত্য[৪]। ২৬৮ নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন। ২৬৯ শ্রীকৃষ্ণ[১]। ২৭০ নৃত্যআসরে গুরুদেব[৭]। ২৭১ শ্রীরাধার বিরহ[২]। ২৭২ ত্রিকালেশ্বর[২] ৪৭×৫৬। ২৭৩ প্রতীক্ষা[২]। ২৭৪ স্বর্ণকুম্ভ বা কলঙ্কভঞ্জন[২]। ২৭৫ আম্রকুঞ্জ[৮]। ২৭৬ কৃষ্ণরাও পওআর[৫]। ২৭৭ বাউল[৮]। ২৭৮ সাঁওতাল-পরিবার[৮]। ২৭৯ শিমূলগাছ[৭]। ২৮০ সীমান্তগান্ধী[৪]। ২৮১ ঘরমুখো সাঁওতাল[৪]। ২৮২ কঙ্কালিতলা[৬]। ২৮৩ নবমেঘ[৬]। ২৮৪ শ্রীচৈতন্যের তীর্থযাত্রা[৬]। ২৮৫ দোলনচাঁপা[৬]। ২৮৬ খোয়াই[৬]। ২৮৭ শারদা[১]। ২৮৮ ঘৃতবিক্রেতা[১]। ২৮৯ ছাগাবতার[৮]। ২৯০ গোয়ালপাড়া গ্রাম[৮]। ২৯১ গোয়ালপাড়ার পথ[৮]। ২৯২ তালবন[৮]। ২৯৩ তেঁতুল গাছ[৭]। ২৯৪-৩৭৬ হরিপুরা পট[৬] (২৪×২৪ মাপে)—ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবন, বিভিন্ন কলা কারুকৃতি বৃত্তি ব্যায়াম ও শীকার -চর্চা, জীবজন্তু

---

† বহু বৎসর ধরে দেবীপূজার প্রাক্কালে একখানি ক'রে ছবি এঁকেছেন (প্রায়শই রেখাচিত্র)— শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছে, একাধিকবার 'উদ্বোধন' পত্রে। সবগুলির তালিকা করা হয় নি।

পাখি, কাল্পনিক রূপ, সব নিয়ে মোট ৮৩ খানি। ৩৭৭ সিন্ধুমুনি। ৩৭৮ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান৫ ১৭´×৩´। ৩৭৯ কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের আগমন-প্রতীক্ষা৩

॥ ১৯৩৮-১৯৫৫ ॥

৩৮০-৩৮৫। বুদ্ধজীবন২। ৩৮৬ বাঁদরওয়ালা৬। ৩৮৭ তাগ্‌দার বাড়ি৬। ৩৮৮ পরগাছার ফুল৬। ৩৮৯ ভুটিয়া৬। ৩৯০ স্নানশেষে৬। ৩৯১ শৈলকুয়াশা৬। ৩৯২ পাইনবন৬। ৩৯৩ কর্ণকুন্তী৬। ৩৯৪ কৃষ্ণার্জুন৬। ৩৯৫ কালিম্পঙের পথ৫। ৩৯৬ তাগ্‌দা৫। ৩৯৭ পাহাড়ি ঝর্ণা৫। ৩৯৮ পাইনবনের পথ৫। ৩৯৯ বনের হরিণ৫। ৪০০ গর্দভ৫। ৪০১ গণেশজননী১। ৪০২ ৮অর্জুন১। ৪০৩ কৃষককুটীর১। ৪০৪ খেলা১। ৪০৫ গ্রামের মধ্যে৮। ৪০৬ কৃষককুটীর৮। ৪০৭ চিত্রাঙ্গদা৮। ৪০৮ পাইনবন৮। ৪০৯ অজয়ের ধারে বনভোজন৮। ৪১০ তালতোড় যেতে৮। ৪১১-৪১৪ বরোদা-কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র: গঙ্গাবতরণ, মীরার জীবন, নটীর পূজা ও অভিমন্যুবধ কয়েক বৎসরে সমাধা হয়। ৪১৫ বাউল৮। ৪১৬ ভীমবাঁধের বন২। ৪১৭ পদ্মিনী৬। ৪১৮ ১শ্রীচৈতন্য-হরিদাস২। ৪১৯ আগমনী। ৪২০ দ্বারোদ্‌ঘাটন। ৪২১ বুদ্ধদেব২। ৪২২ বীণাপাণি২ (ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজে)। ৪২৩-৪২৫ শবরী৬। ৪২৬ অর্ধনারীশ্বর২। ৪২৭ চীনাভবন-ভিত্তিচিত্রে নটীর পূজা৬ ২৮.৫´×৪´। ৪২৮ মায়াবতীর পথে বগিলা৬। ৪২৯ দাবদাহ৬। ৪৩০ গোধূলি৬। ৪৩১ কুক্কুটদম্পতি৬। ৪৩২ মায়াবতী-আশ্রম৫। ৪৩৩ মায়াবতীর পথ৫। ৪৩৪ প্রসাধন১। ৪৩৫ মা১। ৪৩৬ কঙ্কালসার শিব ও অন্নপূর্ণা। ৪৩৭ সবৎসা গাভী৬। ৪৩৮ হাজারীবাগের রাস্তা৬। ৪৩৯ পরেশনাথ পাহাড়৬। ৪৪০ মহুয়াবন৬। ৪৪১ শ্রীরাধা৬। ৪৪২ হাজারীবাগ থেকে রাঁচী৫। ৪৪৩ বরাকর নদী৫। ৪৪৪ মহাবট৫। ৪৪৫ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ৫। ৪৪৬ রাজগৃহের কাঠুরে৫। ৪৪৭ মহিষযূথ৫। ৪৪৮ খাটুলি-চড়নদার৫। ৪৪৯ গৃধ্রকূট যেতে৫। ৪৫০ জরাদেবীর দেউল৫। ৪৫১ মহিষের পিঠে৫। ৪৫২ গৃধ্রকূট৫। ৪৫৩ চখাচখী৫। ৪৫৪ মুখদুম কুণ্ড৫। ৪৫৫ কাঞ্চনজঙ্ঘা৫। ৪৫৬ দুম্‌কার শালবন৫। ৪৫৭ কবরীবন্ধন৬। ৪৫৮ পাহাড় ও কুয়াশা২। ৪৫৯ প্রসাধন২। ৪৬০ কাঞ্চনজঙ্ঘা৬। ৪৬১ দেওদার৬। ৪৬২ সকালের মেঘ৬। ৪৬৩ ভুটিয়া জুয়াড়ি৬। ৪৬৪ কুয়াশায় দার্জিলিঙ৬। ৪৬৫ শ্রবণকুমার৬। ৪৬৬ কাঠ-খোদাই কাজে৬। ৪৬৭ বনের হরিণ৫। ৪৬৮ মেঘের লীলা৫। ৪৬৯ কালো মেঘ৫। ৪৭০ কাঞ্চনজঙ্ঘা৫। ৪৭১ খৃষ্টের ক্রুশবহন১। ৪৭২ মুরগী ও মুরগীর ছানাপোনা১। ৪৭৩ প্রার্থনারত গান্ধীজি১। ৪৭৪ প্রতীক্ষা২। ৪৭৫ বসন্ত৩। ৪৭৬ শকুন্তলা৬। ৪৭৭ নারিকেল-চারা-রোপণ৬। ৪৭৮ পথের কাঁটা১। ৪৭৯ চুল বাঁধা১। ৪৮০ ঋতুসংহার। ৪৮১ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদর্শন২। ৪৮২ গোপালপুর-

সমুদ্র[৫]। ৪৮৩ গোপালপুর-কাঁকড়া[৫]। ৪৮৪ নৌকা ভাসানো[৫]। ৪৮৫ গোপালপুর-সমুদ্রশাখা[৫]। ৪৮৬ আল্পনা (গোপালপুর)[৫]। ৪৮৭ ঢেউ[৫]। ৪৮৮ তিনটি ঘোড়া[৫]। ৪৮৯ কৃষ্ণকলি[৫]। ৪৯০ সমুদ্রবক্ষে[৫]। ৪৯১ উড়িষ্যাদেশিনী[৬]। ৪৯২ দিনযাত্রা[৬]। ৪৯৩ সন্ধ্যা[৬]। ৪৯৪ পল্লীর গায়ক[৬]। ৪৯৫ মেলার পরে[৬]। ৪৯৬ ধীবরপল্লীতে খৃষ্ট[১]। ৪৯৭ পূজারিণী। ৪৯৮ ঘাটের পথে দুই বোন[৬]। ৪৯৯ জল ভরা[৬]। ৫০০ মধ্যাহ্নসমুদ্র[৬]। ৫০১ গোয়ালিনী-দল[৬]। ৫০২ বসন্তোৎসব[৬]। ৫০৩ মৎস্যগন্ধা[৫]। ৫০৪ কোপাই[৫]। ৫০৫ শান্তিনিকেতন-টিলা[৫]। ৫০৬ নৌকা গড়া[৫]। ৫০৭ গোপাল-পুরের ছুতার[৫]। ৫০৮ গোপালপুরের সমুদ্র[৫]। ৫০৯ গৃহমুখে[৫]। ৫১০ আশ্রমে[৫]। ৫১১ আম্রকুঞ্জ[৫]। ৫১২ বটতলা[৫]। ৫১৩ ঝড়[৫]। ৫১৪ কাঠুরে[৫]। ৫১৫ বরুণবন্দনা[৫]। ৫১৬ শান্তিনিকেতন দৃশ্য[৫]। ৫১৭ শালবৃক্ষতলে গুরুদেব[৫]। ৫১৮ সিন্ধুকূলে শ্রীচৈতন্য[৫]। ৫১৯ পূর্ণিমারাত্রে সিন্ধুকূলে শ্রীচৈতন্য[৫]। ৫২০ মূর্ছিত শ্রীচৈতন্য[৫]। ৫২১ সংকীর্তনে শ্রীচৈতন্য[৫]। ৫২২ রাত্রে লালবাঁধ[৫]। ৫২৩ সমুদ্র[৫]। ৫২৪ সাঁওতাল-বিবাহ[১]। ৫২৫ মধুঋতূৎসব[১]। ৫২৬ খেলা। ৫২৭ বর্ষা। ৫২৮ যশোদা-গোপাল[৫]। ৫২৯ যশোদার দধিমন্থন[২]। ৫৩০ [১]মুরলীশিক্ষা[২]। ৫৩১ বসন্তদোলা[২]। ৫৩২ স্বপ্নচারিণী[২]। ৫৩৩ বন্যা[৬]। ৫৩৪ উমার তপস্যা[৬]। ৫৩৫ বালা বৃষ্টির দিনে[৬]। ৫৩৬ গোষ্ঠহারা গো-পাল[৬]। ৫৩৭ আমলকীর কচিপাতা[৬]। ৫৩৮ শর্ষেফুল[৬]। ৫৩৯ তিনটি ঘোড়া[৫]। ৫৪০ উড়িয়া জননী[৫]। ৫৪১ বৃষ্টিতে বাড়ি[৫]। ৫৪২ গোষ্ঠলীলা[১]। ৫৪৩ বধূপ্রসাধন[১]। ৫৪৪ ছুরী শানানো[১]। ৫৪৫ মিস কনকরত্নম্[১]। ৫৪৬ বসন্তে উন্মনা[১]। ৫৪৭ 'সাম্‌লে মাথা'[১]। ৫৪৮ কোপাই[৮]। ৫৪৯ প্রাচীনা[৬]। ৫৫০ লোকনৃত্য[১]। ৫৫১ মৃগতৃষ্ণা[২]। ৫৫২ ডুলি[২]। ৫৫৩ পঞ্চবটী[২]। ৫৫৪ আনন্দ ও প্রকৃতি[১]। ৫৫৫ রাসলীলা[১]। ৫৫৬ পদ্ম[৬]। ৫৫৭ হংসপদী[৬]। ৫৫৮ বৃষ্টিতে মোরগ[৬]। ৫৫৯ দুটি ঘোড়া[৫]। ৫৬০ পঞ্চকন্যা (সাঁওতাল মেঝেন)[৫]

—

শ্রীনন্দলাল বসু এগুলি ছাড়াও অনেক ছবি এঁকেছেন দীর্ঘ শিল্পীজীবনে, তন্মধ্যে 'ভারতীয় সংবিধান' গ্রন্থে অঙ্কিত চিত্রাবলী উল্লেখযোগ্য। [অল্প কয়েকটি মূর্তি করেন, তন্মধ্যে 'নটীর পূজা' বিশিষ্ট।]

শিল্পী পরবর্তী সময়ে কাগজ ছিঁড়ে কার্ডে আঠা দিয়ে এঁটে, যৎসামান্য রেখা-বিন্যাস ক'রে, কদাচিৎ সেরূপ না ক'রেই, খেলাচ্ছলে অনেক ছবি করেছেন— তার অন্যতম নিদর্শন বর্তমান লেখকের 'চিত্রদর্শন' গ্রন্থে আছে, বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হয়েছে আর এই গ্রন্থেও দেওয়া গেল।

মুখ্যচিত্রপঞ্জী

১৯৫৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শিল্পী প্রত্যহ প্রভাতে একখানি ছবি আঁকেন প্রধানতঃ কালীতূলিতে, কদাচিৎ একটু রঙ ছুঁইয়ে, কখনো কখনো প্যাস্টেল বা কিট্রলেখনী -যোগে— তার সংখ্যা স্বতই হাজার পেরিয়ে গেছে। ['একাডেমি অব ফাইন আর্ট্‌স্‌'এর উদ্‌যোগে কলিকাতায় এরূপ ৫০টি ছবির প্রদর্শনী হয় ১৯৬০ সেপ্টেম্বর মাসে।]

শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রাবলী শিল্পীর নিজের কাছে আছে, আর এ দেশে (বিদেশেও) আছে নানা শিল্পসংগ্রহে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

পূর্ববর্তী চিত্রপঞ্জী দ্রষ্টব্য : সংগৃহীত চিত্রের ক্রমিক সংখ্যা

কলাভবন। শান্তিনিকেতন। ১১৩, ১১৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৮, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯
১৭০, ১৭৮, ২০০

ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলী। কলিকাতা। ১৩১, ১৫৩

জাতীয় নব্যকলাশালা। নূতন দিল্লি

শ্রীচিত্রালয়ম্‌। ত্রিবান্দ্রম। ২৬৮

ভারতীয় জাদুঘর। কলিকাতা। ১৪, ৭৭, ১২৭।১

রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর -সংগ্রহ। কলিকাতা। ২১, ২৫, ৮৪, ৮৬।১, ৮৮, ৯১, ১২৭
১৫০, ১৫১, ১৬৫, ১৭৭, ১৯১, ২২৮[২]

শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংগ্রহ। কলিকাতা। ২৩, ২৪, ৬৭, ৯২, ১৪৬, ১৮৬

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র ও শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ -সংগ্রহ। কলিকাতা। ১৮৮, ১৯৬

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় -সংগ্রহ। কলিকাতা। ১৯২।১, ১৯২।২, ১৯২।৩

বর্ধমান-মহারাজ -সংগ্রহ। বর্ধমান। ১৫, ১৭, ২৮

শ্রীকস্তুরভাই লালভাই -সংগ্রহ। আহমদাবাদ। ৩, ৬, ৭, ৯, ১০-১২, ১৬, ২৯, ৩৩
৩৭-৬৩, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৮০, ৯০, ১০৫।১, ১০৫।২
১০৫।৩, ১০৫।৪, ১০৬, ১০৭

শ্রীশ্রীমতী ঠাকুর -সংগ্রহ। কলিকাতা। ১৫৬[২], ১৮৮, ২৮৫, ৪৪৪

শ্রীঅম্বালাল সারাভাই -সংগ্রহ। আহমদাবাদ। ১৩২, ১৪৫, ৩৭৮

শ্রীপ্রতাপ দয়ালদাস -সংগ্রহ। বোম্বাই। ৭৪, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪৫৩, ৪৭২, ৪৮৪, ৫০৬

শ্রীরামেশ্বর মুদালিয়ার -সংগ্রহ। মাদ্রাজ

শ্রীরামকুমার কাজরিমল -সংগ্রহ। ১৫২, ১৫৭, ৪৫৯

স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -সংগ্রহ। কলিকাতা। ৭৪

শ্রীনন্দলাল বসু

এতদ্ব্যতীত শ্রীনিরঞ্জন বসু (২), শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ (১৬০), শ্রীমতী যমুনা সেন (২৭৪), শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (৫২৪), শ্রীবিজয়সিংহ নাহার (৫), শ্রীসুহৃদ্ সিংহ (৮৫), শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (৬৬), শ্রীশান্তি হাথীসিং (১৯৯), শ্রীচিনুভাই ব্যারোনেট (১৮৩২), শ্রীকার্‌ল্ খাণ্ডালওআলা (২২৯), শ্রীরায় কৃষ্ণদাস (৩৭৯) প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ছাত্রছাত্রী সুহৃৎসজ্জনের নিকটেও বহু ছবি অবশ্যই আছে। শিল্পাচার্যের কাছে শোনা আছে তাঁর অন্নপূর্ণা চিত্রটি (২০) রাশিয়ার কোনো অভিজাত পরিবারের সংগ্রহ -ভুক্ত হয়, এখন কোথায় আছে তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কোনো কোনো ছবি শিল্পী একাধিকবার অঙ্কিত করেন। 'নটীর পূজা' -অভিনয়-কালে শিল্পী অনেকগুলি ছবি করেন; তারই আল্‌বাম উপস্থিত জি. বেঙ্কটাচলম্ মহাশয়ের সংগ্রহে আছে এরূপ শোনা যায়। সংখ্যাধিক কার্ড্ স্কেচ শিল্পাচার্যের নিজের কাছে এবং কিছু কিছু তাঁর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী বন্ধুবান্ধবের নিকট আছে— তন্মধ্যে স্বর্গীয় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (হিমালয়ের কার্ড্‌স্কেচ), শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ, শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ ও শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহ (প্রথম দিকের কাজ) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

—

Library IIAS, Shimla
B 759.92 B 299 S
00009490